গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২১ সংখ্যা ২১ - ২৭ জানুয়ারি, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

২৮ জানুয়ারি মহামিছিল সফল করুন

প্রায় প্রতিদিন জনজীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের আক্রমণ ঘটছে। চাকরি কমছে, বেকার বাড়ছে, মূল্যবৃদ্ধি-করবৃদ্ধি হচ্ছে, শিক্ষায় ফি, হাসপাতালের চার্জ, বিদ্যুতের মাশুল, জমির খাজনা ও সেচকর বাড়ছেই, বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলেও পেট্রল-ডিজেল, গ্যাসের বাড়তি দাম নেওয়া চলছেই। আবার সেই অজুহাতে রাজ্য সরকার আর এক দফা বাসভাড়া বাড়িয়েছে। সরকারি আক্রমণের বিরাম যখন নেই, গণআন্দোলনেরও বিরাম থাকতে পারে না। লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এস ইউ সি আই। অবস্থান ধর্না ঘেরাও, বন্ধ, বিদ্যুতের আলোবর্জন, আইন অমান্য প্রভৃতি নানারূপে আন্দোলন অব্যাহত। গণআন্দোলনের হাতিয়াররূপে গড়ে উঠছে গণকমিটি, বিদ্যুৎগ্রাহক কমিটি, যাত্রী কমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী। আন্দোলনের এই ধারাতেই আগামী ২৮ জানুয়ারি লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষরিত ১৯ দফা দাবিপত্র নিয়ে কলকাতার বুকে ঝড় তুলবে এক মহামিছিল, সৃষ্টি হবে এক নতুন ইতিহাস। জনগণের প্রতি আবেদন — আপনারা দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিন, আন্দোলন তহবিলে সাহায্য করুন, মহামিছিলে যোগ দিন।

জমায়েত ঃ দেশবন্ধু পার্ক, বেলা ১২টা

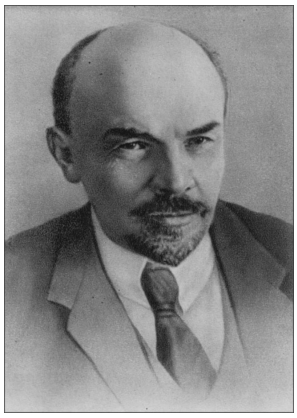

২২ এপ্রিল ১৮৭০ — ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

''...একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্য কখনই সফল হতে পারে না, যদি তা আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে অর্জন করার চেষ্টা হয়। এটি অর্জন করার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শর্ত হল — পার্টির অভ্যন্তরে নেতৃত্বকারী বডিগুলি ও সভ্যদের মধ্যে, সাথে সাথে পার্টির বাইরের সর্বহারা জনতা ও পার্টির মধ্যে সজীব সাহচর্য ও পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা অব্যাহত রাখা।

কমিউনিস্ট পার্টি হবে বিপ্লবী মার্কসবাদ শিক্ষার বিদ্যালয়। সংগঠনের বিভিন্ন অংশ ও সভ্যদের মধ্যে সজীব বন্ধন পার্টি কর্মকাণ্ডে প্রতিদিন সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই দৃঢ় হয়।...''

— লেনিন

ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধে জনগণের সহযোগিতা চাইল যাত্রী কমিটি

সারা বাংলা পরিবহণ যাত্রী কমিটি ১৩ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে অন্যায় অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে এবং তেলের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের করনীতির তীব্র সমালোচনা করে ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটির সম্পাদক সদানন্দ বাগল বলেন — রাজ্য সরকার কেবলমাত্র মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই একতরফা ভাড়াবৃদ্ধি ঘোষণা করে দিচ্ছে। অথচ যে যাত্রীদের এর দায় বহন করতে হবে তাদের মতামত শোনা পর্যন্ত হচ্ছে না। তিনি বলেন — রাজ্য সরকার কেন্দ্রের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে, অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন — কেন্দ্রের এই সরকারকে তাঁরা উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। তাহলে তাঁরা ডিজেলের ওপর কর কমানোর জন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ দিচ্ছেন না কেন? তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকারের উচিত ডিজেলের ওপর রাজ্যের সেস তুলে নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। জেলায় জেলায় যাত্রী কমিটি গঠন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার যদি যাত্রীদের ন্যায্য দাবিগুলির প্রতি কর্ণপাত না করে তবে আন্দোলনকে তীব্রতর করা হবে।

কমিটির সভাপতি বিচারপতি অবনীমোহন সিন্‌হা বলেন — আইনে যাকে ন্যাচারাল জাস্টিস বলে, একতরফা ভাড়াবৃদ্ধির ঘোষণা তার বিরোধী। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, অত্যাবশ্যক পরিষেবা অর্থাৎ পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে। বিশ্বের বহু দেশই তা দেয়, এটা গণতন্ত্রের অঙ্গ। তিনি বলেন, জনগণ অসংগঠিত বলে তাদের কথা সরকার শোনে না। এমনকী অতীতে ট্রান্সপোর্ট কমিশন বসানো হত, এখন তাও হয় না।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন — আপনারা কি বিষয়টা আদালতে নিয়ে যাবেন? কী ধরনের আন্দোলন আপনারা করবেন? উত্তরে বিচারপতি সিন্‌হা বলেন, আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাব, যাত্রীদের মতামত সংগঠিত করব। আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলি বলেন, আমরা যাত্রীদের ওপর কোন কর্মসূচি চাপিয়ে দেব না। যাত্রীরা যেমন যেমন এগিয়ে আসবেন, আন্দোলন তেমন তেমন উচ্চ ধাপে পৌঁছবে। তিনি বলেন, বাস মালিকরাই বলছে — রাজ্য সরকারের চাপানো অত্যধিক ট্যাক্স, অযৌক্তিক জরিমানা এবং পুলিশি জুলুম বন্ধ করলে ভাড়া বাড়াবার কোন দরকার হবে না। রাজ্য সরকার এ কথায় কান না দিয়ে মালিকদের দাবি মতো ভাড়াবৃদ্ধি ঘোষণা করছে, ট্রাম ডিজেলে না চলা সত্ত্বেও ট্রামের ভাড়াও বাড়াচ্ছে। আসলে ভাড়া

সাতের পাতায় দেখুন

ত্রাণকার্যে এস ইউ সি আই কর্মীরা

আন্দামান

সুনামি বিধ্বস্ত সুদূর আন্দামানে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছেছে এস ইউ সি আই মেডিকেল টিম। ১৫ জানুয়ারি পৌঁছানোর পর থেকেই কাজ শুরু হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি রাত বারোটা নাগাদ দলনেতা ডাক্তার কমরেড অশোক সামন্ত টেলিফোনে জানান, ভাদু বস্তি, স্কুল লাইন, চৌলদাড়ি, লোকনাথ পাহাড়, বডমাস পাহাড়, লাল পাহাড়, এবং একেবারে সমুদ্রতট ওয়ান্ডুর অঞ্চলের

সাতের পাতায় দেখুন

তামিলনাড়ু

পশ্চিমবঙ্গ থেকে দলের ত্রাণ ও মেডিকেল টিম ১২ জানুয়ারি তামিলনাড়ু রাজ্যের সর্বাধিক সুনামি বিধ্বস্ত কাড্ডালোর জেলায় পৌঁছেছে। ছয় জন চিকিৎসক সহ এই দলের পরিচালক হিসাবে রয়েছেন কমরেড ডাঃ অংশুমান মিত্র। পার্টির দ্বিতীয় দলটি কমরেড ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়ার নেতৃত্বে ১৭ জানুয়ারি তামিলনাড়ু যাচ্ছে। কেরালা থেকে চারজন ডাক্তার ও একজন সিস্টার, গুজরাট

আটের পাতায় দেখুন

সর্বগ্রাসী পুঁজির ঔদ্ধত্য

১২ জানুয়ারি কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের পঠন-পাঠন-গবেষণা বন্ধ করে বণিকসভার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর 'পার্টনারশিপ সামিট' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পার্টনার ছিলেন বুদ্ধদেববাবুও।

কলকাতায় এত মনোরম স্থান থাকতে 'সারস্বত সাধনা'র ক্ষেত্র বলে পরিগণিত জাতীয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণকে দেশের বড় বড় পুঁজিপতিরা বাছলেন কেন ? পাঁচতারা হোটেলের কনফারেন্স রুম, ব্যাঙ্কোয়েট হলগুলি ছিল, না হলে সায়েন্স সিটি ছিল, আরও নানা বিলাসবহুল সভাগৃহ ছিল। তাঁরা জানতেন, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার তো জানতই যে, ঐতিহ্যময় এই গ্রন্থাগারে রবিবারেও গবেষণা ও পঠন-পাঠনের কাজ বন্ধ থাকে না, বছরে মাত্র তিন দিন বাদে প্রতিদিনই এখানে কাজ হয়। তাহলে 'কর্মসংস্কৃতি'র প্রচারক বণিকসভার কর্তারা কাজ বন্ধ করালেন কেন ? কেবল গ্রন্থাগার নয়, নিরাপত্তার অজুহাতে প্রধানমন্ত্রীর যাতায়াতের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা রাজপথে যানবাহন বন্ধ করা হয়েছে। এও শুধু একদিন নয়। বারো মাস তিরিশ দিনই দেশের কোন না কোন অংশে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা সমমর্যাদার ভি আই পি-রা চলাচল করছেন এবং সেজন্য পথ অবরুদ্ধ করছে পুলিশ। তাতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে না ? নাগরিকের ইচ্ছামতো চলাফেরার সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছে না ? ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না ?

অথচ, গণআন্দোলনে পথ অবরোধ হলে, বছরে এক-দু'দিন বন্‌ধ হলে 'গেল গেল' রব ওঠে। কেন ওঠে ? কেন এই দ্বিচারিতা ? আসলে বণিকসভার কর্মসূচি, ভি আই পি-দের যাতায়াত — এসবের উদ্দেশ্য হল পুঁজির শোষণকে রক্ষা করা, পুঁজিবাদকে রক্ষা করা — যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই, সমাজব্যবস্থার মূলে যে অন্যায় আছে, তার উৎস। গণআন্দোলনের উদ্দেশ্য হল, সেই মূল অন্যায়টাকে সামনে আনা, তার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা। যে 'আন্দোলন' 'আন্দোলন' খেলা সেই মূল অন্যায়কে আড়াল করে ভোটের লড়াইকে সামনে আনে, তাতে মালিকপক্ষের আপত্তি হয় না। যদিও সব আন্দোলনেই জনগণের অংশগ্রহণ ব্যাপক হলে, আন্দোলনের নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার ভয় থাকে, শোষিতশ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধিদের হাতে তা চলে যাওয়ার বিপদ থাকে,

আটের পাতায় দেখুন

দুর্নীতি প্রতিরোধে জয়নগরের মানুষ

গোটা দেশের মতই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষও আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এমনকী যে সামান্য সরকারি সুযোগসুবিধা তাঁদের পাওয়ার কথা, পঞ্চায়েতগুলির দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতার কারণে সেটুকু থেকেও অনেক সময় তাঁরা বঞ্চিত হন। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গ্রামে গ্রামে জোট বাঁধছেন মানুষ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে মায়াহাউড়ি অঞ্চলে তাঁরা গড়ে তুলেছেন 'মায়াহাউড়ি আঞ্চলিক দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি'।

গত ১১ জানুয়ারি প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ জয়নগর ২নং ব্লক আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। তাঁদের দাবি, ভূয়া তালিকা বাতিল করে বিপিএল তালিকায় প্রকৃত গরিবদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অন্নপূর্ণা ও অন্ত্যোদয় যোজনার চাল-গম দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের মধ্যে বন্টন করতে হবে, প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যেককে রেশনকার্ড দিতে হবে এবং তারা যাতে নিয়মিত কেরোসিন তেল পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, নিয়মিতভাবে বার্ধক্যভাতা দিতে হবে, জমির বাড়তি ও মকুব হয়ে যাওয়া খাজনা আদায় বন্ধ করতে হবে, দক্ষিণ বারাসাত থেকে মহিষমারি হাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করতে হবে প্রভৃতি।

এই স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন খালেক মোল্লা, বিমল মণ্ডল, সমরেশ সর্দার, দীনেশ দাস প্রমুখ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন — বিমল মণ্ডল, সমরেশ সর্দার, সুজাতা ব্যানার্জী ও রূপম চৌধুরী।

বাঁকড়ায় হাসপাতাল রক্ষার আন্দোলন

উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত বাঁকড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলছে। আগে এই হাসপাতালে স্থায়ী বেড, ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি ছিল। আজ আর এসব কিছুই নেই। এমনকী একজন স্থায়ী ডাক্তারও নেই। আছেন একজন চুক্তিভিত্তিক ডাক্তার। তাঁকে দিয়ে এই হাসপাতাল বাদেও ঐ ব্লকের অন্তর্গত শাঁড়াপুল বিপিএইচসি-তেও কাজ করানো হয়। এর বাইরে আরও অনেক কাজ তাঁকে দিয়ে করানো হয়। বাস্তবে সপ্তাহে এক-দু'দিনের বেশি রোগীরা ডাক্তার পায় না।

এমনিতেই বন্যা আক্রান্ত এই এলাকার মানুষ অভাব-অনটনে জর্জরিত। হাজার হাজার মানুষ রুজি-রোজগারের জন্য গ্রামছাড়া — ঘরছাড়া। অনাহারে চিকিৎসাহীন মৃত্যুই এখন তাদের ভাগ্যলিপি।

এই অবস্থায় এলাকার মানুষ যখন জানলেন, রাজ্য সরকার জার্মান পুঁজির সহায়তায় ১২ হাজার হাসপাতালকে বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই ধরনের হাসপাতালও তার মধ্যে আছে তখন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বেসরকারীকরণের হাত থেকে হাসপাতালটিকে বাঁচাতে আন্দোলনের কর্মসূচি নেয়। এলাকার মানুষের দাবি — (১) কোনমতে হাসপাতাল বেসরকারীকরণ করা চলবে না, (২) কনট্র্যাক্ট ভিত্তিতে ডাক্তার নয়, অবিলম্বে উপযুক্ত সংখ্যক স্থায়ী ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী চাই, (৩) জীবনদায়ী ঔষধ ও প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা সহ ঔষধ সরবরাহ বাড়াতে হবে, (৪) পূর্বের ন্যায় সংকটগ্রস্ত রোগী ভর্তি রাখবার জন্য বেড চালু করতে হবে। ১০ জানুয়ারি এই দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি হাসপাতালের কর্তব্যরত এম.ও-র কাছে জমা দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক দাউদ গাজি সহ অনিলকৃষ্ণ বিশ্বাস, জিয়াদ সরদার ও অনুপ সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন। ঐদিন এই হাসপাতালকে নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন পরিচালনার জন্য উদ্যোগী মানুষদের যুক্ত করে একটি কমিটিও গঠিত হয়।

সুনামি'র মার্ক্স-বাদ-ই বিশ্লেষণ

সুনামির বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাসের কারণ কী। বিজ্ঞানীরা বলছেন সমুদ্রগর্ভে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। ধর্মগুরুরা হয়ত বলবেন পাপের ফল, পাপে ধরণী পূর্ণ হলে এমনই হয়। ঠিক এমনটা না বললেও সিপিএম যা বলেছে তার মানেটাও ওই পাপেরই ফল। কী বলেছে সিপিএম —

দলের মুখপত্র পিপলস ডেমোক্রেসির (২৭ ডিসেম্বর-২ জানুয়ারি) সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে — ''The tsumani striking us in the last days of 2004 must be seen not as an ominous singal for the future, but as the culmination of a legacy of hate and destruction that we the Indian people, unitedly and finally overcame in the political sphere in 2004''

অর্থাৎ, ''২০০৪ সালের শেষ দিনগুলিতে যে সুনামি আমাদের ওপর আছড়ে পড়েছে তাকে ভবিষ্যতের অশুভ সংকেত হিসাবে বুঝলে হবে না; বুঝতে হবে, যে বিদ্বেষ ও বিনাশের উত্তরাধিকারকে আমরা, ভারতীয় জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ২০০৪-এ পরাজিত করেছি এ হল তারই জের এবং পরিণতি।''

কোন বিদ্বেষ ও বিনাশের রাজনীতি ২০০৪ সালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাস্ত হয়েছে? উত্তর হল — বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিনাশের রাজনীতি। কোন্ ঐক্য তাকে পরাজিত করেছে? উত্তর হল — কংগ্রেস-সিপিএম ঐক্য। অর্থাৎ সমীকরণটা দাঁড়ায়, বিজেপির ঘৃণা ও ধ্বংসের রাজনীতির সুনামির কারণ এবং সুনামির পুনরাবৃত্তি রুখতে কংগ্রেস-সিপিএম ঐক্যকে রক্ষা করতে হবে। এই কংগ্রেস যাই-ই করুক তা সমর্থন করতে হবে না হলে বিজেপিকে ঠেকানো যাবে না। ঠেকানো না গেলে আবার বিদ্বেষ ও বিনাশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আবার সুনামি! তার চেয়ে ভালো তেরঙ্গার পদতলে মাথা ঠোকা, কৃপালাভে দণ্ডবৎ হওয়া। অর্থাৎ নির্জলা সুবিধাবাদ, মার্ক্স যে পুরো বাদ তাতে আর সন্দেহ কী!

কুলতলি ঃ নদী বেঁধে জলাধার কার স্বার্থে

দেশ-বিদেশের ধনীর দুলালদের ফুর্তির আড্ডা বানানোর জন্য সাহারা কোম্পানির কাছে সুন্দরবনকে বেচে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গেছে। তার আগে ঐ সুন্দরবনে পরমাণু কেন্দ্র গড়ার মারণযজ্ঞ রুখে দিয়েছিল প্রান্তবাসী মানুষ। আবার নতুন মতলব ভাঁজা হচ্ছে। কুলতলি ব্লকের গুড়গুড়িয়া-ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া হুকাহারানিয়া নদীটি বেঁধে জলাধার তৈরি করা হবে।

পরিকল্পনা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের — মূল হোতা, দপ্তরের মন্ত্রী সিপিএমের কান্তি গাঙ্গুলি। সুন্দরবনের বহু 'উন্নয়ন' তিনি করেছেন! নদীবহুল কুলতলিতে প্রয়োজনীয় সেতু নেই, জেটি-ঘাট নেই, রাস্তা নেই, স্কুল নেই, চিকিৎসা নেই, নেই এমনকী সাপে কাটার সিরাম পর্যন্ত। কুলতলির বিধায়ক এস ইউ সি আই-এর কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের উদ্যোগে ক্যানিং-এর হেড়োভাঙা থেকে কুলতলির কিশোরীমোহনপুর পর্যন্ত রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল। সেই রাস্তার মাঝে পেটকুল চাঁদ ও নিমানিয়া নদীর মতোই সেতু তৈরি করার কথা ছিল হুকাহারানিয়া নদীর ওপরেও। সরকার তা করেনি। অগ্রাধিকারের তালিকাভুক্ত এরকম বহু বিষয়ের জন্য সরকারের 'টাকা নেই'। অথচ নদীর জলধারা আটকানোর এই সর্বনাশা প্রকল্পের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়ে গেল। কারণ কি নদীভরাট, কন্ট্রাক্টরি, মেছোভেড়ি ইত্যাদি, প্রভৃতি?

সিপিএম বলছে, ঐ নদীটি এখন মরে গিয়েছে। অথচ তাদের কুলতলি-জয়নগর জোনাল কমিটির সম্পাদক যোগেশ ঘোষই বলেছেন, জোয়ারের সময় নৌকা চলাচল করে। অর্থাৎ নাব্যতার সমস্যা আছে। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা করলেই হয়। তাই বলে নদী বুঁজিয়ে দিতে হবে? নদীর গতিপথ বন্ধ করলে রায়দিঘি ও ঢাকির মুখ পর্যন্ত যেতে নৌকার মাঝিদের ৪০-৪৫ কিলোমিটার বেশি ঘুরতে হবে। পরিবেশও নষ্ট হবে। ইতিপূর্বে পিয়ালী নদীতে এইরকম ক্লোজারের পরিণতিতে ক্যানিং-এ মাতলা নদীতে স্বাভাবিক স্রোত বন্ধ হতে বসেছে।

এই সমস্ত কারণে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত এই জনবিরোধী পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। প্রকল্পটির বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে সেচমন্ত্রী গণেশ মণ্ডলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এই সর্বনাশা পদক্ষেপ রুখে দেওয়ার জন্য দলের পক্ষ থেকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে আদালতে যাওয়ারও প্রস্তুতি চলছে।

অসাধু প্রোমোটাররা জলা ভরাট করছে। ঠাণ্ডা পানীয়ের বহুজাতিক কোম্পানির কাছে কোন কোন রাজ্য সরকার নদী বেচে দিচ্ছে। এবার সিপিএম সরকারও কি নদী ভরাট করে সেইপথেই যাবে?

শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস দূরে সরানো রুখে দিল বোলপুরের জনগণ

পুলিশি বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর বীরভূমের বোলপুরে ৪৮ ঘণ্টার বন্ধ সফলতার সঙ্গে পালিত হয়। বন্ধের প্রথম দিন এস ইউ সি আই বোলপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড শম্ভু ব্যানার্জীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জনগণ সকলপ্রকার ভয়ভীতি উপেক্ষা করেই বন্ধকে সফল ও সর্বাত্মক করে তোলেন।

সিপিএমের বোলপুর সাংসদ তথা লোকসভার স্পীকার সোমনাথ চ্যাটার্জী সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করে কালো টাকার মালিক ব্যবসাদার অম্বুজা, পিয়ারলেস ও নেওটিয়াদের স্বার্থে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠে প্রান্তিক উপনগরী গড়ে তুলেছেন। ওখানকার যোগাযোগের সুবিধার জন্য মূল মহকুমা শহর বোলপুরের একাংশ থেকে যাত্রীবাহী বাস তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসকে প্রান্তিক স্টেশন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। যার ফলে বোলপুর শহর শ্মশান ও পঙ্গু হওয়ার সম্মুখীন। স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ফলশ্রুতিতে প্রতিবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গড়ে ওঠে গণকমিটি। এস ইউ সি আই তার সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে গণকমিটির আন্দোলনে সামিল হয়। ২ অক্টোবর ৮ ঘণ্টার রেল অবরোধ অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন সাময়িকভাবে জয়যুক্ত হলেও পৌষ মেলার অছিলায় শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসকে পুনরায় টেনে নেওয়ার চেষ্টা চলে। সেই অপচেষ্টা রুখতে ২০ ডিসেম্বর পথ অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। সিপিএম নেতৃত্ব আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিছিল করে এবং প্রশাসনকে দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করায়। কিন্তু ঐদিন সরকার, প্রশাসন ও সিপিএমের হুমকি অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার মানুষ যখন অবরোধে সামিল হয়, তখন পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ব্যাপকভাবে লাঠিচার্জ করে। ১৮ জন আহত হন, একজনের অবস্থা গুরুতর। এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেড শম্ভু ব্যানার্জী ও কমরেড বিজয় দলুই সহ ৫ শতাধিক অবরোধকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের এই বর্বর আচরণের বিরুদ্ধে ৪৮ ঘণ্টা বোলপুর বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল ২১ ও ২২ ডিসেম্বর। আন্দোলনের চাপে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস-এর সম্প্রসারণের কাজ স্থগিত হয়ে যায়। এস ইউ সি আই নেতৃত্বের সংগ্রামী ভূমিকা স্থানীয় জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছে।

হাবড়া ১নং ব্লক হাসপাতালে বিক্ষোভ

গ্রামীণ হাসপাতালগুলি বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে হাবড়া ১নং ব্লক বামুনগাছি বিপিএইচসি-তে চার শতাধিক মানুষ হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও বিএমওএইচ-এর কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। এরপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির বিশিষ্ট সংগঠক গোপাল বিশ্বাস, নুরুল আমিন, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা শিবানী হালদার ও বিভিন্ন গ্রাম কমিটির সদস্যরা। কনভেনশনে কালিদাস মণ্ডলকে সভাপতি ও আমীর বৈদ্যকে সম্পাদক করে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ব্লক সংগঠন গড়ে তোলা হয়।

অন্যায় ভাড়াবৃদ্ধি রুখতে

এলাকায় এলাকায় যাত্রী কমিটি গড়ে তুলুন

মূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি ও বার বার পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধির চাপে বিপর্যস্ত জনগণের ঘাড়ে আবার পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধির অসহনীয় বোঝা চাপিয়ে দিল সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। ২৮ বছরের রাজত্বে এ সরকার এর আগে ১৬ বার ভাড়াবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। প্রথম স্টেজে ন্যূনতম বাসভাড়া ২০ পয়সা থেকে বাড়াতে বাড়াতে ৩.০০ টাকায় নিয়ে এসেছে। এবার মালিকরা দাবি করছে ন্যূনতম ভাড়া ৪.৫০ টাকা করতে হবে।

বাস মালিকরা সংগঠিত। মালিকদের সঙ্গে সরকারের যে অশুভ বোঝাপড়া আছে রাজ্যবাসীর আজ আর তা অজানা নয়। তেলের দামবৃদ্ধির একটা ছুতো পেলেই মালিকরা ভাড়াবৃদ্ধির দাবি তোলে। অবশ্য প্রায় প্রতিবারই দেখা গেছে, মালিকরা ভাড়াবৃদ্ধির দাবি করার আগেই পরিবহণ মন্ত্রী সাফাই গাইতে শুরু করেন — তেলের যা দাম বেড়েছে, ভাড়া না বাড়ালেই নয়। রাজ্য সরকার নিজেই বড় বাসমালিক। সরকারি মালিকানাধীন রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় চলে পুকুর চুরি — আছে সীমাহীন দুর্নীতি, চূড়ান্ত অব্যবস্থা, মাথাভারি প্রশাসন, মন্ত্রী-আমলাদের রাজকীয় খরচ, গাড়ি, বিদেশভ্রমণ, বেতন ইত্যাদি। এসবেই চলে যায় কোটি কোটি টাকা। এ নিয়ে সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। জনগণের পক্ষে অপরিহার্য পরিবহণ ক্ষেত্রেও সরকার ক্রমাগত ভাড়া বাড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও যাত্রীদের জন্য সাধারণ সরকারি বাস এখন আর প্রায় নেই বললেই চলে। বহু রুটে সরকারি সাধারণ বাস যা আগে চলত এখন তা উঠে গেছে। যেগুলো চলে, তার প্রায় সবই অনেক বেশি ভাড়ার বাস। তাই ভাড়াবৃদ্ধির আগ্রহ বাসমালিকদের মত রাজ্য সরকারেরও প্রবল। অন্যদিকে বেসরকারি মালিকদের বাস প্রতি কর্মচারীর সংখ্যা খুব অল্প হওয়ায় এবং কর্মচারীদের স্থায়ী চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না দেওয়ায় খরচ কম। ফলে বেসরকারি বাস মালিকরা প্রভূত লাভ করে।

এবার রাজ্য সরকার ভাড়া বাড়াচ্ছে এমন একটা সময় যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমছে। এখনই দাম ২১.৮ শতাংশ কমে গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলেও কেন্দ্রীয় সরকার তেল কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফার স্বার্থে এদেশে তেলের দাম কমাচ্ছে না। তেলের দাম বেশি থাকলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কর বাবদ আয় বেশি হয়। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও তেলের দাম কমানোর জন্য কেন্দ্রের উপর কোন চাপ সৃষ্টি না করে সমস্ত বোঝাই শোষিত নিষ্পেষিত জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, যা সংঘবদ্ধ শক্তি না থাকার ফলে মেনে নিতে না চাইলেও জনগণ মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাসমালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সরকার বারবার বাসের ভাড়া বাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ যে জনগণের পকেটের পয়সায় বাসপরিবহণ চলে, বাস মালিকদের বাবুয়ানি চলে, সেই যাত্রী সাধারণের সমস্যা, তাদের মতামত — কোন কিছুই জানার প্রয়োজন মনে করে না সরকার। যাত্রীরা সংগঠিত হলে — সেই সংগঠিত আন্দোলনের চাপেই সরকারকে বাধ্য করা যায় ভাড়াবৃদ্ধির প্রশ্নে যাত্রী সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে।

আমাদের দল দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে — কেবলমাত্র বাসমালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে একতরফা মালিকদের দেওয়া আয়ব্যয়ের মনগড়া হিসাবকে সত্য বলে ধরে নেওয়া চলবে না। কিন্তু মালিকশ্রেণীর আজ্ঞাবহ সরকার এই দাবি মেনে নেয়নি।

সংবাদপত্রে প্রকাশ, সরকার প্রতি স্টেজে ৫০ পয়সা করে ভাড়া বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই হারে ভাড়া কোন্ যুক্তিতে সরকার বাড়াতে চায় তা বোধগম্য নয়। মালিকদের বাড়তি মুনাফা পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন যুক্তি এর মধ্যে নেই।

তেলের অল্প পরিমাণ দাম বৃদ্ধির ফলে বাস পরিবহণে বিপুল লোকসান হচ্ছে বলে মালিকরা হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। বাস্তবে বাস মালিকদের যদি লোকসান হতো, তাহলে সর্বশেষ গত ৪ নভেম্বর তেলের দামবৃদ্ধির পর আজ পর্যন্ত আড়াই মাস আগের ভাড়াতেই বাসমালিকরা লোকসান দিয়ে বাস চালাচ্ছে একথা কেউ বিশ্বাস করবে কি ? গত বার বাসভাড়া বাড়ানো হয়েছিল দ্বিতীয় স্টেজে এক টাকা, পরবর্তী স্টেজগুলিতে ৫০ পয়সা হারে। অথচ তেলের দাম মাত্র ২.৫০ টাকা বেড়েছিল। অতীতে যতবারই ভাড়া বাড়ানো হয়েছে তা তেলের দামবৃদ্ধির হারের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি হারে। পরিবহণ মন্ত্রী নিজেই বলেছেন, 'আমরা এমনভাবে নতুন ভাড়ার হার ঠিক করতে চাইছি, যাতে কিছুদিন অন্তত তা বজায় রাখা যায়।' (আনন্দবাজার ২৪-৬-০২)। তেলের দামের তুলনায় ভাড়াবৃদ্ধি বেশি হারে করায় মালিকরা অতিরিক্ত যে লাভ করে পরবর্তীকালে কয়েকবার তেলের দাম বাড়লেও মালিকদের উপরি লাভ তাতে কিছুটা কমে মাত্র লোকসান হয় না। গত ২০০২ সালের জুলাইতে ভাড়া বাড়ানোর সময় পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী বলেছিলেন, ১৫% ভাড়া বাড়ানো হল — ৬% তেলের দাম বাড়ার জন্য এবং ৯% বাসের চেহারা পরিবর্তন করে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য (ঐ)। ভুক্তভোগী বাসযাত্রীদের অভিজ্ঞতা কী? বাসমালিকরা বাসের কোন কিছুই পরিবর্তন করেনি। যা ছিল তাই রয়েছে। মাঝখান থেকে গত ২০০২ সাল থেকে টিকিট প্রতি ৯% অতিরিক্ত বাড়তি ভাড়া গরিব জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে মালিকরা নিয়ে যাচ্ছে বাড়তি লাভ হিসাবে। শুধুই কি তাই, বাস মালিকদের আরও বেশি লাভ পাইয়ে দিতে তাদের স্বার্থে দূরত্বের স্টেজ ভেঙে আরও ছোট করে দিয়েছে। আগে ৬ কিমি ভিত্তিক স্টেজ ছিল। ২০০২ সালে ভাড়া বাড়ানোর সময় তা কমিয়ে ৪ কিমি ভিত্তিক স্টেজ করে দেওয়া হয়। এইভাবে যাত্রীদের নানা কৌশলে ঠকিয়ে তেলের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি মুনাফা বাসমালিকদের পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকার নিজেই একজন বাসমালিক হওয়ার ফলে সেও এই সুবিধা নিচ্ছে। তেলের সামান্য মূল্যবৃদ্ধির জন্য বাড়তি যতটুকু খরচ হয়, বাসমালিকদের তাতে যথেষ্ট মুনাফার কিছু অংশ হয়ত কমতে পারে। লোকসান হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। তাই তেলের দামবৃদ্ধির পর পুরনো ভাড়ায় আড়াই মাস চালিয়ে যেতে মালিকদের লোকসান হচ্ছে না। যদি সত্যি লোকসান হতো তাহলে একদিনও লোকসান দিয়ে মালিকরা বাস চালু রাখত না।

ভারতবর্ষে তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এর কারণ তেলের দামের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিপুল পরিমাণ শুল্ক ও সেস ধার্য করে রেখেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যদি এই শুল্ক ও সেস তুলে নেয় তাহলে পেট্রলের দাম কমে হয় ১৭.৪৬ টাকা এবং ডিজেলের দাম কমে হয় ১৮.০৭ টাকা (প্রতিদিন, ৮-১২-০৪)। সিপিএম সরকার প্রতিবারই একটা লোকদেখানো মৌখিক শুল্ক কমানোর দাবি জানালেও কেন্দ্রের ওপর কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করতে কোন আন্দোলন গড়ে তুলছে না। সিপিএম সরকার যে ডিজেলের উপর ১৭% বিক্রয় কর ও লিটারে এক টাকা সেস চাপিয়ে রেখেছে তা তুলে নিলে ডিজেলের দাম ৪.০০ টাকার বেশি কমে যায়। কিন্তু রাজ্য সরকার তা করতে রাজি নয়। তারা সমস্ত বোঝাটাই চাপিয়ে দিচ্ছে অসহায় জনগণের ঘাড়ে। বাসের উপর রাজ্য সরকার যে বর্ধিত কর চাপিয়েছে এবং জরিমানার হারও অনেক পরিমাণ বাড়িয়েছে, তার বিরুদ্ধে মালিকরা কোন আন্দোলন গড়ে তুলছে না। ভাড়া বাড়িয়ে জনগণের ঘাড় ভেঙে এ খরচটাও সরকার মালিকদের আদায় করে দিচ্ছে। তাছাড়া সরকার নিজেই ভাড়া বাড়াতে চায়, অথচ ভাড়া বাড়ালে বামপন্থী ভাবমূর্তি থাকে না বা জনসাধারণের ক্ষোভ থেকেও বাঁচা যায় না, তাই ভাব দেখায়, যেন অনন্যোপায় হয়ে সরকার ভাড়া বাড়াচ্ছে, কিন্তু জনস্বার্থে বাসমালিকরা যত দাবি করছে তত নয়। দীর্ঘদিন ধরে এইভাবেই বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণকে প্রতারণা করে যাচ্ছে।

সরকার ও বাসমালিকরা পরিকল্পিতভাবে প্রতিবার বাসভাড়া বাড়ানোর সময় একটা নাটক করে। বারবার করার ফলে এই নাটকটা রাজ্যবাসী ধরে ফেলেছে। এই নাটকটা হচ্ছে মালিকদের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ায় যে বর্ধিত ভাড়া সরকার ঘোষণা করে, মালিকরা তা না মেনে আরও বেশি ভাড়াবৃদ্ধির দাবি করে। সরকার ভাব দেখায় মালিকদের দাবি কোনভাবে মানবে না। মালিকরা মিটিং-মিছিল-ধর্না, এমনকী একদিনের ধর্মঘট পর্যন্ত করে। শেষপর্যন্ত দেখা যায়, সরকার ঘোষিত বর্ধিত ভাড়াই মেনে নিয়ে মালিকরা বাস চালায়। এতে সাপও মরে অথচ লাঠিও ভাঙেনা, অর্থাৎ এতে মালিকদের লাভ বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়, আবার জনগণকে দেখানোও যায় যে, এই সরকার জনস্বার্থ রক্ষায় এতটা তৎপর যে কিছুতেই মালিকদের অন্যায় দাবির কাছে মাথা নত করেনি। এই চালাকিটা জনগণ ধরে ফেলার পর এর সাথে আর একটা পদ্ধতি তারা যোগ করেছে, তা হচ্ছে, সরকার বর্ধিত ভাড়া ঘোষণা করলেও মালিকরা সঙ্গে সঙ্গে তা চালু করে না। বেশ কিছুদিন তারা পুরনো ভাড়াই নিতে থাকে। ফলে ভাড়াবৃদ্ধিতে জনসাধারণের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় তা ধীরে ধীরে কমে যায়। তারপর হঠাৎ একদিন মালিকরা বাড়তি ভাড়া নিতে শুরু করে। ততদিনে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সেই তীব্রতা অনেকটা কমে গিয়েছে। এই সরকার এত ধূর্ত এবং কৌশলী যে, তাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে মালিকরা নতুন বর্ধিত ভাড়া সব রুটে এক সাথে চালু করে না। প্রথমে দু-একটা রুটে নতুন ভাড়া চালু করে, অন্য রুটগুলিতে পুরনো ভাড়াই নিতে থাকে। এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে নতুন ভাড়া সব রুটে চালু করে। গতবার বর্ধিত বাসভাড়া ঘোষণার পরেও কিছু কিছু রুটে সেই বর্ধিত ভাড়া নিতে শুরু করেছে প্রায় আড়াই-তিন মাস পর, ততদিন পুরনো ভাড়াই নিয়ে গেছে। কারণ সরকারের অভিজ্ঞতা আছে, সমস্ত রুটে এক সাথে বর্ধিত ভাড়া চালু করলে সমস্ত মানুষের ক্ষোভ একসঙ্গে ফেটে পড়ে, যেটা সামাল দেওয়া সরকারের পক্ষে কঠিন হয়। অথচ এইভাবে দু-একটি রুটদিয়ে বাড়তি ভাড়া নিতে শুরু করলে সেই দু-একটি রুটের যাত্রীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ থেকে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে না। কারণ অন্যান্য রুটে পুরনো ভাড়া চালু থাকায় সামগ্রিকভাবে প্রতিবাদ বা ক্ষোভবিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে না। এই প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে একের পর এক রুটে বাড়তি ভাড়া চালু করা হয় যাত্রীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে সহনশীল করে নিয়ে। তাছাড়া রাজ্যের সমস্ত জেলায় একই সঙ্গে ভাড়া বাড়ানো হয় না, তাই আন্দোলন রাজ্যব্যাপী সংগঠিত করা যায় না। এইভাবে জনগণকে ঠকাতে অত্যন্ত দক্ষ একটা চূড়ান্ত জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা — বিশেষ করে পুলিশের সাথে পার্টির গুণ্ডাবাহিনী নামিয়ে সরকার যেখানে নির্মমভাবে আন্দোলন দমন করতে পিছপা হয় না — কত কঠিন তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারবেন।

প্রতিবার ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই'র নেতৃত্বে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। দলের কর্মীরা এই আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশ ও সিপিএমের পোষা সমাজবিরোধীদের আক্রমণে রক্তাক্ত হয়, জেলে যায়। '৯০ সালে এই আন্দোলনে কমরেড মাধাই হালদার পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। আরও ৩২ জন কর্মী গুলিবিদ্ধ হন।এই প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে '৮৩ সালে ভাড়া কমাতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। বিভিন্ন জেলায় এই আন্দোলনের চাপে সরকার ভাড়া কমাতে বাধ্য হয়েছে, নিত্যযাত্রী ও ছাত্ররা কনশেসন ভাড়ায় যাতায়াত করার দাবি আদায় করেছে। কিন্তু আংশিক সাফল্য হলেও সম্পূর্ণ বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা যায়নি সরকারকে। কারণ কেবলমাত্র দলের কর্মীবাহিনীর ওপর নির্ভর করে কোন গণআন্দোলন সফল হতে পারে না, যদি জনগণ সংগঠিতভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে। আশার কথা, রাজ্যের অসংগঠিত পরিবহণ যাত্রীদের সারা বাংলা সংগঠন 'সারা বাংলা পরিবহণ যাত্রী কমিটি' গড়ে উঠেছে ৭ জানুয়ারি কলকাতায় এক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে। এই সংগঠনের সভাপতি হয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় অবনীমোহন সিন্‌হা এবং সম্পাদক হয়েছেন শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা সদানন্দ বাগল। যাত্রীদের সংগঠিত করে এই যাত্রী সংগঠনের শাখা কমিটি প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি রুট ধরে স্টপে স্টপে গড়ে তুলতে পারলে সরকারের এই অন্যায় ও অযৌক্তিক ভাড়াবৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে রুখে দেওয়া সম্ভব হবে, সরকারকেও যাত্রীদের কথা শুনতে বাধ্য করা যাবে। সারা বাংলা পরিবহণ যাত্রী কমিটি রাজ্যের পরিবহণ যাত্রীদের সংগঠিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

হৈ চৈ করে শিশুদিবস উদযাপিত হয়

শিশুদের খোঁজ কে রাখে

ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন ১৪ নভেম্বর শিশুদিবস হিসাবে প্রতি বছর উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে। এ বছরও হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করেছে ঃ ''শিশুদের অধিকারকে নিশ্চিত করুন। আমাদের দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে নিশ্চিত করুন।'' বিজ্ঞাপনে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ আপনি কি একটি শিশুর অধিকারগুলি জানেন? তারপর প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে (১) শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য সুবিধার অধিকার, (২) মারণরোগগুলি থেকে মুক্তির অধিকার, (৩) স্বাস্থ্য-পরিষেবা এবং চিকিৎসার অধিকার, (৪) যত্ন, সুরক্ষা এবং উন্নত পুষ্টির অধিকার, (৫) খেলাধুলা, অবসর এবং বিনোদনের অধিকার, (৬) যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষার অধিকার, (৭) আর্থিক শোষণ থেকে সুরক্ষার অধিকার, (৮) অবহেলা, দুর্ব্যবহার, বেআইনি ব্যবসায় ব্যবহার এবং সমস্ত ধরনের নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষার অধিকার প্রভৃতি। ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে শিশুদের জন্য জাতীয় সনদ। অধিকারগুলি সুরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে শিশুদের জাতীয় কমিশন, আই সি ডি এস প্রোগ্রাম, সর্বশিক্ষা অভিযানের মধ্যে ৬-১৪ বছর বয়সীদের লেখাপড়া শেখানো, পালস পোলিও টীকাকরণ কর্মসূচী — এমন কত কী!

নিউ ইয়র্কে ২০০২ সালের মে মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশনে ছোটদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। সংবাদে প্রকাশ, দেড়শ' দেশের প্রায় চারশ' শিশু প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত থেকে তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আশঙ্কা নিয়ে মনের কথা শুনিয়েছে। জাঁদরেল রাষ্ট্রনায়করা ঘোষণা করেছেন, ছোটদের জন্য বিশ্বপরিবর্তনের কার্যক্রমে ছোটদেরও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এই আশা থেকেই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে 'শিশুর প্রাপ্তবয়স্ক অংশগ্রহণ'। এই পরিকল্পনার পিছনে যে ধারণা কাজ করে তার মোদ্দা কথা হল, শিশুরা যেন দৈনন্দিন জীবনে পরিবার, স্কুল, কমিউনিটি, এমনকী রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে ডায়ালগের মাধ্যমে ও প্র্যাকটিসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'সুনিশ্চিত কৈশোরে' পৌঁছতে পারে। (বর্তমান ১২-৩-০৪) শুধু রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ অধিবেশনের কর্মকাণ্ডেই কিন্তু চমক শেষ হয়নি। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'স্টেট অব্ দি ওয়ার্ল্ডস্ চিলড্রেন রিপোর্ট'-এ সমাজের দুর্বল অংশের ভোটদানে অক্ষম অল্পবয়সী গোষ্ঠীর (vulnerable and disenfranchised age section) প্রাপ্তবয়স্ক ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। (ঐ)

সারা বিশ্বে ''শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ'' — এই মর্মে বক্তৃতা যত বাড়ছে, শিশু কল্যাণের নানারকম পরিকল্পনা ও দিবস যত ঘোষণা হচ্ছে, বাস্তব জীবনে শিশু-কিশোরদের জীবন ততই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আধুনিক বিশ্বে, বরং আরও সঠিকভাবে বললে বর্তমান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী 'গণতন্ত্রের' বিশ্বে শিশুর জীবনের দাম কানাকাড়িও নেই। আন্তর্জাতিক স্তরে ও জাতীয় জীবনে শিশু সংক্রান্ত কল্যাণের প্রতিশ্রুতিগুলির দাম ছেঁড়া কাগজের চাইতেও কম।

যে রাষ্ট্রসংঘ শিশুদের নিয়ে বিশেষ অধিবেশন সংগঠিত করছে ও উদ্বেগ প্রকাশ করছে, তারাই কখনো নিষ্ক্রিয় থেকে কখনো সক্রিয় সমর্থনে দেশে দেশে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও আগ্রাসন চাপিয়ে দিচ্ছে, যার প্রথম বলি হচ্ছে শিশু এবং নারীরা। প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান ও ইরাকে প্রতিদিন ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধজোটের ঘাতকবাহিনী হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করছে, বিকলাঙ্গ করছে, পিতামাতাহীন অনাথ করে দিচ্ছে। এই নির্মম অপরাধের বিচার কে করবে? প্রখ্যাত বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল 'দি ল্যানসেট' বলেছে, ১,০০,০০০ ইরাকী নাগরিক নিহত হয়েছে। (দি স্টেটস্‌ম্যান, ১-১২-০৪) ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত নানা দেশে এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের পরিণামে ২০ লক্ষেরও বেশি শিশু খুন হয়েছে। আহত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়েছে ৬০ লক্ষের বেশি শিশু। এ তথ্য জানাচ্ছে ইউনিসেফ (বর্তমান ১২-৩-০৪)। এই নারকীয় বর্বরতা, বিশেষ অধিবেশনের বক্তৃতা দিয়ে আড়াল করা যাবে কি? সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ভারতবর্ষের উন্নয়নের রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাওয়া শিশু-জগতের করুণ ছবিটা কেমন?

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি হল শিশু। দেশ স্বাধীন হয়েছে সাতান্ন বছর। অথচ ছয় বছরের নীচে ৬ কোটি শিশু বাস করছে দারিদ্র্যসীমার নীচে। অভাবের জ্বালায় মা বিক্রি করে দিচ্ছে শিশুকে এমন সংবাদ প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে আসছে। প্রতি ২ জন শিশুর একজন অপুষ্টিতে ভোগে, আর এক বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায় ২০ লক্ষ শিশু প্রতি বছর। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের ৫০ শতাংশই শিক্ষার দরজা মাড়াতে পারে না। (দি স্টেটস্‌ম্যান, ২১-৪-০৪)। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ নাগরিককে এমনভাবে পদপিষ্ট করে সত্যিই কোন দেশের উন্নয়ন বা অগ্রগতি সম্ভব কি? স্বাস্থ্যবীক্ষণ (জানুয়ারী, '০৩) পত্রিকায় বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশঘটিত অসুখে মারা যায় ৫০ লক্ষ শিশু প্রতি বছর।

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ্ সার্ভে-২ (এন এফ এইচ এস-২)-এর সর্বশেষ সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১৪-২-০৪)। এ বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষার সূচনা করেছিল এন এফ এইচ এস-১। শিশুর অবস্থান, তার পুষ্ঠানুপুষ্ঠ তদন্ত, নারীর অবস্থান এবং আরও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তা সত্যানুসন্ধান করেছে। সার্ভের দ্বিতীয় রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, অধিকাংশ রাজ্যেই ৬০-৮০ শতাংশ শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ৩৫ মাস, রক্তাল্পতায় ভুগছে। সরকারি ভাষ্যে 'ধনী' পাঞ্জাবেও এই সংখ্যা কিন্তু ৮০ শতাংশ। অনেকেই মনে করতে পারেন, এটা বোধহয় শিশুদের লালন-পালন করার প্রয়োজনীয় চেতনার অভাবের জন্যই ঘটছে। এ ধারণা ভুল। শিশুপালনের চেতনার অভাব থাকতেই পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'ধনী দেশ', 'ধনী রাজ্য', 'উন্নত দেশ', 'উন্নত রাজ্যে'র অর্থ হল — এসব ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে ধন কেন্দ্রীভূত হয়েছে বেশি। মানে, সখ্যাগরিষ্ঠের ক্রয়ক্ষমতা এখানে দ্রুত কমে যাচ্ছে। ধনী ও নির্ধনের পার্থক্য রেখা স্পষ্ট, বিভাজন দ্রুততর, বৈষম্য প্রকট। দারিদ্র্যের ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি শিশুদের জীবনে অনিশ্চয়তা আনছে, রোগগ্রস্ত করছে, শিশুদের হত্যা করছে। দারিদ্র্যের মাপকাঠি নিয়ে বিতর্ক মেনে নিলেও বলা যায়, ৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে ৭৫ কোটি ৬০ লক্ষ লোক যে দেশে ক্ষুধার্ত, নিরক্ষর, শৌচাগারহীন বস্তিতে পাশবিক জীবন-যাপনে বাধ্য হয় — সেখানে শিশুর ভবিষ্যৎ এইসব পরিবারের বিপর্যয়ের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে কেমন করে সুন্দর হবে? অরক্ষিত পরিবারে সুরক্ষিত শিশুর ধারণাই কি অবাস্তব নয়? দিনে এক ডলারের মধ্যে (বর্তমানে টাকার অঙ্কে ৪৫ টাকা) রোজগার করে এদেশে ৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ লোক, যা আমেরিকা ও জার্মানির মোট জনসংখ্যার সমান! সাম্প্রতিক মানব উন্নয়ন সূচকে ১৭৭টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ ১২৩তম। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫-৮-০৪)।

ঐ গবেষকদের রিপোর্টে শিশুর স্বাস্থ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বয়স অনুপাতে ওজন কম 'আন্ডার ওয়েট', বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম 'স্টানটেড', উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কম 'ওয়েস্টেড।' ওদের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে শিশুদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ 'আন্ডার ওয়েট', ৪৬ শতাংশ 'স্টানটেড', ১৬ শতাংশ 'ওয়েস্টেড'। অপুষ্টির বিচারে সারা দুনিয়ার মধ্যে এই হার সর্বোচ্চ। (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১৪-২-০৪)। এই শিশুদের মায়েদের অবস্থাও একই রকম। যেখানে ৫২ শতাংশ মায়েরা রক্তাল্পতায় ভোগেন সেখানে তাঁদের শিশুরা কেমন হতে পারে? এই পশ্চিমবঙ্গে মায়েদের অবস্থা আরও খারাপ। এই রাজ্যে ৬০ শতাংশ শিশু ও মায়েরাই রক্তাল্পতার শিকার (ঐ)। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ এই আটটি রাজ্যে দেশের ৭৭ শতাংশ শিশুই অপুষ্টির শিকার। এদেশে জন্মলগ্নেই মারা যায় ৬৭ শতাংশ নবজাতক। ৫৭ শতাংশ নবজাতকের জন্মের সময় কোন শিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী থাকেন না। শিশুরা কতখানি অবহেলিত এই সমাজে, এতেই বোঝা যায়। ১৯৮৯-৯০-এ প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, আদিবাসীদের মধ্যে শিশুদের অবস্থা করুণ। ৬০ শতাংশ মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে।

এদেশে শিশুমৃত্যুর বেদনাদায়ক ও ভয়াবহ ছবিটার জন্য সীমাহীন দারিদ্র্য দায়ী, এ সত্য আর কোনভাবেই লুকানো যাচ্ছে না। এন এইচ এফ এস-২ সমীক্ষা জানাচ্ছে 'প্রধানত অপুষ্টিই শিশুমৃত্যুর কারণ।' অন্যান্য পুঁজিবাদী, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের শিশুমৃত্যুর ওপর সমীক্ষা চালিয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও বাল্টিমোরের জন্স হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল। গবেষক-দলের মুখপাত্র অধ্যাপক লরা কলফিল্ড বলেছেন, ''অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুমৃত্যু সর্বাধিক হওয়ার কারণ একটাই, যেকোন সুস্থ শিশুর থেকে এদের শরীর অনেক অশক্ত। ফলে ভেঙে যায় তাড়াতাড়ি।'' মার্কিন গবেষকরা ১০টি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে বলেছেন, ''৫২ শতাংশের বেশি শিশুমৃত্যু ঘটে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকার জন্য। ৪৫ শতাংশ শিশু মারা যায় হাম বা বসন্ত হওয়ার জন্য। ৬০ শতাংশ শিশুমৃত্যুর কারণ ওজন হ্রাস ও শারীরিক দুর্বলতা। (আনন্দবাজার ২৪-৯-০৪)। বিশ্বে প্রতিটি শিশুকে পেট ভরে খাওয়াতে পারলেই এ ট্র্যাজেডি ঠেকানো যেত।'' এদেশ থেকে পোলিওকে নির্মূল করার সরকারি ঢক্কানিনাদে যত মানবিক আবরণই থাক, শিশু হত্যার সুপরিকল্পিত এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে আড়াল করা যাবে না।

সাম্প্রতিক ইউ এন ডি পি মানব উন্নয়ন রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতে মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ অপুষ্টির শিকার। অথচ সরকারি গুদামে হাজার হাজার টন খাদ্য মজুত। এমনকী এত মজুত খাদ্য কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রীতিমত বিব্রত। একদিকে খাদ্যের প্রাচুর্য — তার পাশে অনাহারে মৃত্যু। উন্নয়নের এমন বীভৎস ছবি এ রাজ্যেও। অনাহারে মৃত্যু অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও বাড়ছে। সরকারি পর্যায়ে নগ্ন স্বীকৃতি হল, ২ কোটি মানুষ এ রাজ্যে একবেলা আধপেটা খেয়ে থাকে। এমনকী রোজ খেতেও পায় না। ব্যাপক জনতাকে অভুক্ত রেখে দারিদ্র্যের চরম সীমায় ঠেলে দিয়ে, গোটা জাতিকে রোগগ্রস্ত দুর্বল করে দিয়ে পরিবারের শিশুদের কেমন করে কল্যাণ করা সম্ভব? সারা পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থানে এদেশের শিশুশ্রমিক। এ রাজ্যেও এ সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। খেলা, লেখাপড়া, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর শৈশব আজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে শিশুর জীবন থেকে। কেড়ে নিয়েছে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ও রাষ্ট্র।

কর্মহীনতার দরুন গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। ছিন্নমূল মানুষের স্রোত ছুটছে শহরে, কাজের আশায়। ২০০১ সালে যেখানে ৩১.৬ শতাংশ মানুষ বাস করত শহরের বস্তিতে, আজ সেই সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৪৩ শতাংশে পৌঁছেছে। শহরে দারিদ্র্য বৃদ্ধির হার দ্রুততর হচ্ছে। ভারতবর্ষে মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ সংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত। বাকি সবই তো যার যার তার তার। বাস্তুহীন, কর্মহীন, ছিন্নমূল মানুষের উদ্বাস্তু স্রোত নতুন শতাব্দীতে বিশ্বায়নের দুনিয়ায় মারাত্মক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। বাড়ছে ভবঘুরে শ্রমিকের সংখ্যা। ১৯৫০ সাল নাগাদ মাত্র ১৮ শতাংশ মানুষ বাস করত শহরে। ২০০০ সালে এই সংখ্যা ৪০ শতাংশ। ২০৩০ সালে পৌঁছাবে ৫৬ শতাংশে। (দি স্টেটস্‌ম্যান ১০-৭-০৪)। গ্রামের ছবি হবে ৫০-এর মন্বন্তরের মতো। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে তকমাধারীদের এই ছবিটা বিশ্বায়নের গতিপ্রকৃতিকে নগ্নভাবে প্রকাশ করছে। এই ছিন্নমূল মানুষের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার।

আগাছার মত বেড়ে ওঠা শিশুদের অনেকেই হয়ে উঠছে অপরাধী, ক্রিমিনাল। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে ১৯৯৭-৯৯ এই সময়ে খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, রাহাজানির মত অপরাধে ধৃত ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা ৫৫,১৭৯ (আনন্দবাজার ১০-৭-০৪)। প্রকৃত সংখ্যা নিঃসন্দেহে বলা যায় এর চাইতে বহুগুণ বেশি। ভীতিজনক তথ্য হল, শিশু কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রতি পাঁচজন কিশোরীর একজন যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। আর কিশোরদের দশজন প্রতি একজন শিকার হচ্ছে চরম শারীরিক নির্যাতনের। (দি স্টেটস্‌ম্যান ১৭-৮-০৪)। ভারতীয় শিশুরা হয়ে উঠছে যৌন সম্ভোগের উপাদান। আন্তর্জাতিক ট্যুরিস্ট স্পটগুলিতে আজ এই জঘন্য কারবার চলছে। এদেশও ব্যতিক্রম নয়। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় মেয়ে পাচারের ব্যবসাটি খুব লাভজনক। এই ব্যবসা আনুমানিক ২০ মিলিয়ন ডলারের। এই পতিতাবৃত্তির বাজারে ২৫-৩০% ব্যবসা(!) দেয় শিশুরা। বিশ্ব শ্রমসংস্থার হিসাবে ভারতবর্ষে ২৩ লক্ষ নারী এই পেশায় নিযুক্ত। এছাড়া আছে 'ফ্লোটিং' গার্ল। প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আসে হাজার হাজার মেয়ে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের মতে নেপাল থেকেই আসে বছরে ৫-৭ হাজার, যাদের বয়স ১০ থেকে ১৮ বছর। ১৪ বছরের মধ্যে বয়সের কিশোরীদের আগমনবৃদ্ধির হার বছরে ৮ থেকে ১০ শতাংশ। মানবাধিকার কমিশনের এক সচিবের মতে ২০ লক্ষের মধ্যে ৫ লক্ষই নাবালিকা, যার মধ্যে ২০ শতাংশের বয়স ১০ এর নিচে। দুঃখের বিষয়, ১৯৯৮ সালে এদেশে যত কেনা-বেচা হয়েছে, তার ৪৫ শতাংশ কেনা ও ৭৭ শতাংশ বেচা হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। এরই নাম শিশু সুরক্ষা?

সারা বিশ্বের ১২ কোটি শিশু যারা প্রাথমিক শিক্ষার মুখ দেখতে পায় না, তার ৫৩ শতাংশ শিশুকন্যা। উন্নয়নশীল দেশগুলির ১৫ কোটি শিশু শারীরিক ও মানসিক অপুষ্টির কারণে কার্যত মৃত্যুপথযাত্রী। আর ১৮ কোটি শিশু নিকৃষ্ট শ্রমে নিযুক্ত (বর্তমান ১২-৩-০৪)। 'স্টেট অব দি ওয়ার্ল্ডস্ চিলড্রেন্স রিপোর্ট'০৩-এর এই মর্মান্তিক রিপোর্ট পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় শিশুদের সস্তা মজুর হিসাবে, আধুনিক সভ্যতার জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের, সভ্যতার উচ্ছিষ্টের মত অবস্থানের জ্বলন্ত উদাহরণ। একটু বেঁচে থাকার

সাতের পাতায় দেখুন

তিন রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন

গণআন্দোলনের শক্তিকে জয়ী করুন

আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে বিহার, ঝাড়খন্ড ও হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কোন্ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই নির্বাচন হচ্ছে, এবং আমাদের দল জনগণের প্রতি কোন্ আহ্বানের ভিত্তিতে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে, তারই একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে প্রকাশ করা হল।

বিহার

বিহারে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে জোট গঠন ও সিট ভাগাভাগির প্রশ্নে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতালোভী প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির নীতিহীন চূড়ান্ত সুবিধাবাদী চরিত্র খোলখুলি বেরিয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন যে সিপিএম সদম্ভে শক্তি প্রকাশ করে থাকে, বিহারে তারাই সিটের লোভে লালুপ্রসাদের লেজুড়ের ভূমিকা নিয়েছে। বিহারে ক্ষমতাসীন সরকার দলিত ও পশ্চাদপদ জনগণের উত্থানের যে কথা বলে তার অন্তঃসারশূন্যতাও সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে।

দলিত, পিছিয়ে-পড়া তথা সাধারণ মানুষের দল বলে বড়াই করতে করতে প্রথমে জনতা দল (এর সঙ্গে একসময় লোক জনশক্তি পার্টির রামবিলাস পাশোয়ান, জনতা দল ইউনাইটেড-এর জর্জ ফার্নান্ডেজ ও নীতীশ কুমারও যুক্ত ছিলেন) এবং পরে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের লালু-রাবড়ি সরকার বিগত ১৫ বছর ধরে বিহারে ক্ষমতায় আসীন। নিজেদের 'সামাজিক ন্যায়ের প্রতীক' বলে ঘোষণাকারী লালু-রাবড়ি সরকারের ১৫ বছরের শাসনে রাজ্যের সাধারণ মানুষ কেমন আছেন — এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, দলিত, দুর্বল এবং পিছিয়ে-পড়া মানুষের উন্নয়ন তো দূর অস্ত, এই সময়ের মধ্যে তাঁদের অবস্থা আরও বেশি খারাপ হয়েছে। যোজনা কমিশনের রাষ্ট্রীয় মানব উন্নয়ন ২০০১-এর রিপোর্ট অনুসারে সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে গরিব এবং পিছিয়ে-পড়া রাজ্য হল বিহার। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যার দিক থেকেই হোক, অশিক্ষিত কিংবা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া 'ড্রপআউটে'র সংখ্যার দিক থেকেই হোক, অথবা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিংবা গ্রামীণ বিকাশ — রিপোর্ট অনুযায়ী, সব দিক দিয়েই বিহার আজ দেশের নিম্নতম সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে (হিন্দুস্তান, ১৫-৭-২০০২, বিহার)।

বিহার ভেঙে পৃথক রাজ্য ঝাড়খণ্ড গড়ে ওঠায় কল-কারখানার একটি বড় অংশ বিহার থেকে বেরিয়ে গেছে। যে ক'টা রয়ে গেছে, সেগুলোও এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিংবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। একটি হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় ১০ হাজার ছোট বড়ো কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। (তথ্যসূত্র ঐ)। বারাউনি এবং কাঁটি থার্মাল পাওয়ার-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন থমকে দাঁড়িয়েছে। চিনি উৎপাদনে অগ্রণী এই রাজ্যের অধিকাংশ চিনিকল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। ভারত ওয়াগন থেকে শুরু করে আই ডি পি এল-এর মতো কারখানাগুলিতে পর্যন্ত তালা ঝুলছে। কংগ্রেস জমানায় বন্ধ হয়ে যাওয়া 'রোহতাস্ উদ্যোগ সমূহ', তথা 'অশোক পেপার মিল' খোলবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় বসে লালু-রাবড়ি সরকার জনবিরোধী কংগ্রেস সরকারের নীতিই অনুসরণ করে চলেছে। এই সরকার প্রথমে 'বিহার রাজ্য পথ পরিবহণ নিগম' বন্ধ করে দেবার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, পরে বন্ধ না করে কর্মচারীদের অর্ধেক বেতনে কাজ করতে বাধ্য করেছে। তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, এই সংস্থার প্রায় সাত হাজার কর্মচারীকে ছয় বছর ধরে অর্ধেক বেতনে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। এক ডজনেরও বেশি বোর্ড কিংবা নিগম ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি বোর্ড এবং নিগমের ৩৫ হাজার কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৩ হাজার কর্মচারী প্রতি মাসে নিয়মিত বেতন পান (হিন্দুস্তান, ১০-৯-০৩)। বেতন না পেয়ে বহু কর্মচারীর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। আন্দোলনরত কর্মচারীদের সাথে যে সমস্ত চুক্তি হয়েছে, কিংবা তাঁদের যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সরকার সেগুলিও পালন করছে না। কর্মচারীরা আন্দোলনে নামলে তাঁদের দমিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। আন্দোলনরত নিগম কর্মচারীদের ওপর কালাকানুন 'এসমা' পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়েছে।

রাজ্যে শিক্ষার হালও খুব খারাপ। এ'রাজ্যে ৫২.৪৭ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে নিরক্ষর হল ৮০ শতাংশ। অধিকাংশ স্কুলেরই কোন ঘর নেই, পানীয় জল এবং শৌচালয়েরও ব্যবস্থা নেই। যে সব স্কুলে এইসব ব্যবস্থা আছে, সেখানে আবার শিক্ষক নেই। একদিকে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটানো হচ্ছে, অন্যদিকে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীতে বোর্ডের পরীক্ষা চালু করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। দশম শ্রেণীতে পৌঁছানোর আগেই প্রায় ৮৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে দেয় (হিন্দুস্তান, ১৫-৭-০২)। বিহার রাজ্যের শিক্ষাজগতের একটি বিশেষ সমস্যা হল — স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ স্তর পর্যন্ত শিক্ষকের অভাব। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষক এবং কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। এত অসুবিধা সত্ত্বেও যেসব যুবক কোনক্রমে লেখাপড়া শিখতে পারছে, তাদের কাছে রোজগারের সমস্ত দরজা বন্ধ। এরাজ্যের প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিকের কাজ না পেয়ে অন্য রাজ্যে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কৃষকরা ন্যায্য দামে সার ও বীজ পায় না। এবারের রবিশস্যের মরশুমে ৫০০ টাকা দামের ডি এ পি সারের বস্তা সাড়ে ছ'শো থেকে সাতশো টাকায় খোলাবাজারে বিক্রি হয়েছে। এর ওপর আছে ভেজাল। ইউরিয়া সারও দেড় গুণ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। বিদ্যুৎ অমিল। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ঘায়ে কৃষক চরম দুরবস্থায় পড়েছে। কেরোসিন তেল কালোবাজারে ৩৫ টাকা প্রতি লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার হাল এমনই যে, সরকারি হাসপাতালগুলিকে মানুষ যমের বাড়ির সমতুল্য বলে মনে করছে। রাজ্যের ৮৪% শিশু অপুষ্টির শিকার। ৩ বছরের কম বয়সী ৬০ শতাংশ শিশু অ্যানিমিয়াগ্রস্ত। প্রতি পাঁচ জন মহিলার মধ্যে দু'জনই অপুষ্টির শিকার (হিন্দুস্তান, ১০-৯-০২)। রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের নামে বিপুল অর্থ নয়ছয় হওয়ায় সড়কগুলির অবস্থা শোচনীয়। গর্তে ভরা রাস্তাগুলিতে প্রতিদিন প্রায় ডজন খানেক যানবাহন দুর্ঘটনায় পড়ে এবং বহু মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে। প্রায় প্রতিদিনই সকাল থেকে মৃত্যুর খবর আসতে থাকে।

প্রতি বছরই বন্যায় বহু লোকের প্রাণ যায়। বন্যা এবং খরায় লক্ষ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়; অথচ এই পরিস্থিতি রুখবার মতো কোনও বিশেষ পরিকল্পনা সরকারের হাতে নেই। উপরন্তু সাহায্য-প্রার্থী বন্যাপীড়িত মানুষদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়ে বহুজনকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না। লুঠ, হত্যা, অপহরণ, বলাৎকার এবং দুর্নীতি আজ বিহার রাজ্যটির দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এইভাবে এখানে মানুষ কী করে বেঁচে রয়েছে; পুলিশই বা কী করছে ! রাস্তায় হোক বা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই হোক, এরাজ্যে মানুষ কোথাওই আজ আর নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারছে না (হিন্দুস্তান, ২১-১১-০৪)। রাজনীতিবিদ-অপরাধী-পুলিশ-এর দুষ্টচক্র সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। সরকারি গোয়েন্দা রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক নেতাদের রক্ষী ও দেহরক্ষী হিসাবে রাজ্যের ৩ হাজার ৫০০টি অপরাধীগোষ্ঠী নিযুক্ত আছে।

এই অবস্থায় বিহারে যখন গণআন্দোলন গড়ে তোলা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল, তখন শ্রমিক-কৃষকের দল হিসাবে নিজেদের ঢাক পেটাতে পেটাতে সি পি আই (এম) গণআন্দোলনের রাস্তা ছেড়ে আর জে ডি-র লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই আসন ভাগাভাগি নিয়ে রফা না হওয়ায় আর জে ডি'র সঙ্গ ত্যাগ করেছিল। আজ আবার আর জে ডি-কংগ্রেস জোটে সামিল হতে সেই সি পি আই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। রাজ্যে নিজেদের বামপন্থী বলে এবং শ্রমিক-কৃষকের হিতৈষী বলে যারা ঘোষণা করে, সেই সি পি আই এম এল-লিবারেশন, সুবিধাবাদের প্রতিযোগিতায় অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও ছাড়িয়ে গেছে। যে মুলায়ম সিং যাদব প্রয়োজনে বিজেপি'র সঙ্গে যেতে গররাজি নয় বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁর সমাজবাদী পার্টি, কিংবা চন্দ্রশেখরের সংযুক্ত জনতা পার্টি, অথবা এই ধরনের অন্যান্য জাতপাতবাদী, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলির সাথে এই সি পি আই এম এল-লিবারেশনের দহরম-মহরম গড়ে তুলতে বাধেনি। অপরাধের রাজত্ব খতম করার হুঙ্কার দিতে দিতে সি পি আই এম এল-লিবারেশন আগামী নির্বাচনে মাত্র কয়েকটা সিট পাওয়ার ঘৃণ্য লক্ষ্য পূরণ করতে রামবিলাস পাসোয়ানের সাথে বোঝাপড়া করতে ব্যগ্র, যে রামবিলাস পাসোয়ানের নাম আজ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের সাথে সমার্থক। লোক জনশক্তি পার্টি সম্পর্কে লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের বক্তব্য হল — "এই দলটি কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারের শরিক। এতে অবশ্য তাঁদের কোন আপত্তি নেই; তবে লোক জনশক্তি পার্টিকে অবশ্যই স্থির করতে হবে যে বিহার রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা কংগ্রেসের সাথে থাকবে কিনা" (হিন্দুস্তান, ৩-১-০৫) সুবিধাবাদী রাজনীতির অপর প্রতীক রামবিলাস পাসোয়ান কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, কয়েক মাস আগে আর জে ডি-কংগ্রেস জোটের সাথে হাত মিলিয়ে নির্বাচনে লড়ে এবারে তিনি কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন। আবার, আর জে ডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবও কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারেরই মন্ত্রী। তাঁরা কেন্দ্রে হাত মেলালেও বিহার রাজ্যে রামবিলাস পাসোয়ান লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে বিধানসভায় লড়ছেন এবং এ কাজে তাঁর প্রধান ভরসা তাঁর নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী।

এইরকম একটি পরিস্থিতিতে বিহারে আজ যা প্রয়োজন তা হল সর্বস্তরের মানুষকে সংগঠিত করে গণআন্দোলন গড়ে তোলা। এস ইউ সি আই সর্বশক্তি দিয়ে এই রাস্তাতেই লড়ছে। চাষী-মজুর, ছাত্র-যুবক তথা অন্যান্য জনগণের সমস্যাগুলি নিয়ে এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে যুক্ত আছে।

ঝাড়খণ্ড

ঝাড়খণ্ডে সমস্ত সংসদীয় দলগুলিই ভোট টানতে নিজেদের মধ্যে আঁতাত ও আসনরফা নিয়েই প্রবল ব্যস্ত। রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, গরিব মানুষ, তথা সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার মতো সময় এই দলগুলির নেই। তাই সমাজের অধিকাংশ মানুষের চোখে এরা আজ অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র।

বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীনই সাধারণ মানুষের জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। তাদের 'সুরাজ' এবং 'স্বরাজ'-এর চটকাদারী স্লোগান যে নেহাত চালাকি ছিল — তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। দুর্নীতি, বর্বরতা এবং লুটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে ঝাড়খণ্ড। বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা, কন্ট্রাক্টর, ক্রিমিনাল, আমলা ও পুলিশের এক দুষ্টচক্র রাজ্যে সরকারের সমান্তরাল এক ব্যবস্থা তৈরি করেছে।

২০০০ সালের নভেম্বর মাসে বিহার থেকে কিছু অঞ্চল কেটে নিয়ে আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্য তৈরির সময়ই আমাদের দলের পরিষ্কার বক্তব্য ছিল যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আলাদা করে নতুন একটি রাজ্য গঠন করার দ্বারা সাধারণ মানুষের সমস্যার কোনও সমাধান করা তো যায়ই না, বরং জনগণের অবস্থা আরও খারাপ হয়। হয়েছেও ঠিক তাই। ক্ষমতায় যারা বসল, প্রচুর সম্পদ কুক্ষিগত করে তারা কোটিপতি বনে গেল, অন্যদিকে উপজাতি ও পিছিয়ে-পড়া অন্যান্য অংশের মানুষের উন্নয়নের স্বপ্ন আকাশে মিলিয়ে গেল। এ রাজ্যে মানুষ না খেতে পেয়ে, ওষুধ ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না পেয়ে মারা যাচ্ছে। অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া; বিশুদ্ধ পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। চালু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নতুন কলকারখানা তৈরি হচ্ছে না। বেড়ে যাচ্ছে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা। ক্রমাগত বেড়ে চলা লক-আউট, লে-অফ এবং ছাঁটাইয়ের কবলে পড়ে রাজ্যের বিরাট অংশের মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থার অভাবে চাষের জমি নিষ্ফলা অবস্থায় পড়ে থাকছে। সার, বীজ সহ চাষের সমস্ত উপকরণের দাম বিপুল হারে বাড়ছে, অথচ চাষী ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেনা। ফলে চাষীদের জীবন হয়ে উঠেছে যন্ত্রণাময়। শিক্ষাব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বইপত্র নেই, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রশাসনিক চাপ সহ নানা সংকটে জর্জরিত। স্কুলে-কলেজে ফি-বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে। মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চলছে ক্যাপিটেশন ফি। পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষক তথা পড়াশোনার সামগ্রিক পরিবেশের অভাবে বহু ছাত্রছাত্রী অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। একইভাবে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কলকারখানার অভাবে বহু শ্রমিক কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছে।

নিজেদের 'শৃঙ্খলাপরায়ণ' বলে জাহির করলেও বিজেপি দলটির শৃঙ্খলার যে কী হাল, তাদের নেতা-কর্মীদের আচরণ দেখে রাজ্যের মানুষ ইতিপূর্বেই তা টের পেয়েছে। একে অপরের নামে কুৎসা করাটাই এই দলের নেতাদের প্রধান কাজ। পূর্বের এন ডি এ সরকারের অন্য শরিক দলগুলির কথা উল্লেখ না করাই ভাল। এই সমস্ত দলগুলি কখনও হিন্দু তাস খেলে, কখনও 'ডোমিসাইল'-এর মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে, কখনও বা বাংলাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব করে ঝাড়খণ্ডের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিজেদের ভোট-ব্যাঙ্ক তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এদের ভূমিকা গত কয় বছরেই জনগণের মধ্যে এত বিরূপতা ও ঘৃণার সৃষ্টি করেছে যে, জনগণের ভোটে এদের জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আবার এই বিজেপি-এন ডি এ বিরোধী মানসিকতাকে কাজে লাগাতে জোট বেঁধে ভোটযুদ্ধের ময়দানে নেমেছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল। যদিও পুঁজিপতিদের সেবার কাজে বিজেপি সহ এন ডি এ-র শরিক দলগুলির তুলনায় এরাও কম দড় নয়। সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিয়ে এদেরও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কংগ্রেস ও তার জোটের দলগুলি এখন কেন্দ্রের সরকারে এবং তাদের এই ক' মাসের শাসনেই বোঝা গেছে যে, এন ডি এ সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতি ও পরিকল্পনাগুলিকেই কংগ্রেসের ইউ পি এ সরকার অনুসরণ করবে। ফলে ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য এদের কাছ থেকে কী-ই বা আশা করা যায়!

ছয়ের পাতায় দেখুন

তিন রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন

পাঁচের পাতার পর

অন্যান্য রাজ্যের মতো ঝাড়খণ্ডেও সিপিআই এবং সিপিএম একই ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। বামপন্থী আন্দোলনের পতাকা মাটিতে ফেলে দিয়ে এই দল দু'টি আজ গদির লোভে চরম সুবিধাবাদের আশ্রয় নিচ্ছে। জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করার বদলে ঝাড়খণ্ডে এরা কংগ্রেস এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সঙ্গে সিট ভাগাভাগির খেলায় নেমেছে।

হরিয়ানা

হরিয়ানাতে ভোট আসতেই গদিসর্বস্ব দলগুলি নতুন নতুন মিত্র'র খোঁজে নেমে পড়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ১০টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনে জয়ী হয়ে কংগ্রেস ৮ বছর আগে হারানো বিধানসভা ফিরে পেতে উঠে পড়ে লেগেছে। একইভাবে চৌতালার নেতৃত্বে শাসক ভারতীয় লোকদল কৃষক, বেকার এবং সাধারণ মানুষকে কাছে টানতে লোকভোলানো নানা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এতে সাধারণ মানুষের সমর্থন লোকদলের দিকে চলে যেতে পারে ভেবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার কংগ্রেস খুবই চিন্তিত। তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগেই চৌতালার লোকদল পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনগুলি সেরে ফেলতে চাইলে কংগ্রেস তাতে বাধা দিতে শুরু করে। একাজে সে দোসর হিসাবে বিজেপি'কে নেয়। শেষপর্যন্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট এই নির্বাচনে স্থগিতাদেশ জারি করে দেয়।

ভজনলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসই প্রথম হরিয়ানা রোডওয়েজ বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। তারপর, বংশীলালের নেতৃত্বে হরিয়ানা বিকাশ পার্টি ও বিজেপি জোট সরকার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ভেঙে তিনটি কর্পোরেশনে পরিণত করে এবং কৃষি ও গৃহস্থের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম বিপুল হারে বাড়িয়ে দেয়। যে লোকদল সে সময়ে এর বিরুদ্ধে প্রবল সোচ্চার ছিল, এমনকী ক্ষমতায় এলে বিদ্যুৎ পর্ষদের পুনরায় একীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারাই ক্ষমতায় এসে পূর্ব প্রতিশ্রুতি শুধু অস্বীকার করে তাই নয়, বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের নীতিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও কার্যকরী করে। ওমপ্রকাশ চৌতালার নেতৃত্বে জাতীয় লোকদল সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ফি-বৃদ্ধি করে ও বিপুল পরিমাণ ডোনেশন চালু করে এবং শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার অবাধ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আইন করে প্রাইভেট স্কুল খোলার ঢালাও ব্যবস্থা করে দেয়। হাসপাতালের আউটডোর চার্জ চালু করে ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জও বাড়িয়ে দেয়। ভজনলালের সময় থেকে কৃষিক্ষেত্রে বকেয়া বিদ্যুতের দাম একসঙ্গে জোর করে আদায় করতে গেলে কৃষকরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং পুলিশের গুলিতে ৫ জন কৃষক নিহত হন। কংগ্রেস ও এইচ ভি পি-বিজেপি জোট উভয় সরকারের সময়েই পুলিশের গুলিতে প্রতিবাদী কৃষকদের মৃত্যু ঘটেছে। লোকদল সরকার বেকারদের চাকরির আবেদনপত্রে চাপানো ৫০০ টাকা ফি লোকসভা নির্বাচনে ১০টি আসনই হারানোর পর প্রত্যাহার করে নিয়েছে। হরিয়ানা ক্ষুদ্রসেচ টিউবওয়েল কর্পোরেশন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে কয়েক হাজার কর্মী কাজ হারিয়েছে। আইন করে চুক্তি চাষ চালু করার জন্য চৌতালা সরকার বিধানসভায় একটি বিল আনার চেষ্টা করেছিল, এস ইউ সি আইয়ের প্রবল বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি, যদিও এ নিয়ে কৃষকরা যথেষ্ট উদ্বেগে রয়েছে।

বিজেপি'র সঙ্গে চৌতালার সম্পর্ক ভালই ছিল। রাজ্যে চৌতালা সরকারকে বিজেপি সমর্থন করত, বিনিময়ে কেন্দ্রে বিজেপি জোট সরকারকে সমর্থন করত চৌতালার দল। কিন্তু গত লোকসভা ভোটে হরিয়ানায় আসন ভাগাভাগি নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, বন্ধুত্ব ভেঙে যায়। তাই এবার ভোটের আগে চৌতালার কাছে বিজেপি হয়ে গেছে পুঁজিপতিশ্রেণীর দল ও কংগ্রেসের মতোই জনগণের শত্রু। বিপরীতে চৌতালার সরকারের পতন ঘটানোর জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে বিজেপি। কংগ্রেস চৌতালা সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চৌতালা সরকারও জনসমর্থন আদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বকেয়া বিদ্যুৎ বিলে যেমন ছাড় ঘোষণা করেছে, তেমনি বিদ্যুতের দামেও ছাড় ঘোষণা করেছে। বার্ধক্যভাতা বাড়িয়েছে, বেকারভাতা ঘোষণা করেছে।

এসত্ত্বেও চৌতালা সরকার সম্পর্কে মানুষের বিক্ষোভ কিছুমাত্র কমেনি, বরং সরকারের অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী ও তার দুই পুত্রের যে পারিবারিক হুকুমদারি রাজ্যে চলছে, তার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ উত্তরোত্তর বাড়ছে।

কংগ্রেস, বিজেপি ও জাতীয় লোকদল — এদের একে অন্যের সঙ্গে নীতিগত কোনও বিরোধিতা নেই, জনবিরোধী আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে এরা সকলেই এক। তাই ভোটের লড়াইয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে কংগ্রেস-বিজেপি'র মতো প্রধান বিরোধী দলগুলির নেতাদের মুখে কেবলমাত্র চৌতালার পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধেই কথা শোনা যাচ্ছে।

বিজেপি, একটি সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে রাজ্যে মিও সম্প্রদায়ের চাষীদের (একটি মুসলিম সম্প্রদায়) সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। কংগ্রেস এ ব্যাপারে নীরব, বরং সেও আঞ্চলিকতাবাদ, প্রাদেশিকতাবাদ এবং জাতপাতের রাজনীতিতে মদত দিয়ে চলেছে। সকলেই জানেন, ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার জলবণ্টন সংক্রান্ত সমস্ত চুক্তিকে একতরফাভাবে নাকচ করে দেয়, যাকে বিজেপিও সমর্থন করেছিল। অথচ, হরিয়ানায় এবার ভোটে কংগ্রেস জলবণ্টন বিতর্ককে চৌতালা সরকারের বিরুদ্ধে একটি 'ইস্যু' করে তুলেছে। বিজেপিও একই কাজ করছে।

আমাদের বিশ্লেষণ সত্য প্রমাণিত

এইভাবে পুঁজিবাদী আক্রমণে জনজীবন যখন চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত এবং তিনটি রাজ্যের আসন্ন ভোটকে ঘিরে বুর্জোয়া সংসদীয় দলগুলো যখন নীতিহীন আঁতাত ও ভোটে জেতার নানা মতলববাজিতে ব্যস্ত, তখন সি পি এম এবং সি পি আই, যারা নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করে, অথচ গণআন্দোলনের পথ ত্যাগ করেছে, তারাও কংগ্রেসের সাথে, বিহারে কংগ্রেসের সহযোগী আর জে ডি'র সাথে এবং ঝাড়খণ্ডে জে এম এম-এর সাথে গলাগলি করছে, এদের তোষামোদ করে দু'-চারটে সিট পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণের দুর্ভোগ নিয়ে এদেরও কোনও মাথাব্যথা নেই।

আমাদের দেশে গরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণের জীবনে বেঁচে থাকার সমস্যা উত্তরোত্তর যে বাড়ছে, অপরদিকে মুষ্টিমেয় ধনী আরও ধনী হচ্ছে, এটা কোনও নতুন বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। আমাদের দল বরাবর দেখিয়ে আসছে যে, এই পরিস্থিতি স্বাধীনতার পর গত ৫৭ বছর ধরে পুঁজিবাদী শ্রেণীশাসনের অনিবার্য ফল। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে একটি বিশ্লেষণে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দেখিয়েছিল যে, নির্বাচন এমন একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বিশ্বায়ন-উদারীকরণ নীতির ধ্বংসাত্মক পরিণামে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষক কংগ্রেসই প্রথম এই নীতি ১৯৯১ সালে চালু করেছে, পরবর্তীকালে বিজেপি'র এন ডি এ সরকার তা জোরকদমে অনুসরণ করেছে। নির্বাচনে বিজেপি বা কংগ্রেস অথবা অন্য যেকোন জোটই সরকার করুক না কেন, এই জনবিরোধী আর্থিক নীতিই চলবে। আমরা আরও বলেছিলাম, সি পি এম এবং সি পি আই-এর মতো 'বামপন্থী' দলগুলো নিছক কিছু সিট পাওয়ার জন্যই কংগ্রেসের সাথে সুবিধাবাদী আঁতাত করছে। নিজেদের সুবিধাবাদী চরিত্র আড়াল করার জন্য সি পি এম, বিজেপি'র সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করতে নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার আওয়াজ তুলেছে, এটাও নিছকই ছলনা। কারণ, শুধুমাত্র নির্বাচনে পরাস্ত করার দ্বারা বিজেপি'র সাম্প্রদায়িকতাকে কার্যকরীভাবে রোখা যাবে না। কেবলমাত্র গণআন্দোলন ও দেশব্যাপী কষ্টসাধ্য আদর্শগত-সংস্কৃতিগত সংগ্রামই সাম্প্রদায়িকতার বিপদের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিষেধক রূপে কাজ করতে পারে। গত নির্বাচনের ফল পর্যালোচনা করে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছিল, বিজেপি'র অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঘৃণা নির্বাচনী ফলাফলের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। সি পি এম, সি পি আই গণআন্দোলন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে যেকোন উপায়ে কিছু সিট পাওয়ার রাজনীতির পথ নেওয়ায় একটা বামপন্থী গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে উঠতে পারেনি, যার সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদেরই অপর বিশ্বস্ত সেবাদাস কংগ্রেস, বিজেপিকে সরিয়ে সরকার পেয়েছে। এর দ্বারা দেশে দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার বুর্জোয়া অপচেষ্টা সফল হয়েছে। কংগ্রেস সরকারের প্রতি সমর্থন জানানোর দ্বারা সি পি এম-সি পি আই বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রের শরিকের ভূমিকা পালন করেছে।

কংগ্রেসের সরকারে বসার পরবর্তী ঘটনাবলী আমাদের দলের বিশ্লেষণকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণ করেছে। সি পি এম, সি পি আই-এর মতো 'বামপন্থী'দের সমর্থনে ইউ পি এ সরকারকে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে ক্ষমতায় বসানোর দ্বারা শাসকশ্রেণী রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়েছে। কংগ্রেস আগের মতোই পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবা করে যাচ্ছে। ২০০৪-০৫ সালের বাজেট ও অন্যান্য নীতিগত ব্যবস্থাদির মধ্য দিয়ে ইউ পি এ সরকার জনবিরোধী আর্থিক 'সংস্কার'-এর কার্যক্রম জোর কদমে চালিয়ে যাচ্ছে, যেটা পূর্বতন বিজেপি সরকার করেছিল। সংস্কারকে 'মানবিক' করা হবে বলে মনমোহন সিংয়ের ঘোষণা একটি নির্ভেজাল ভাঁওতা যার দ্বারা কংগ্রেস জনগণকে আন্দোলনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, আর কংগ্রেসকে এই প্রতারণা চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে সি পি এম-সি পি আই-এর সমর্থন। মাঝে মাঝে কংগ্রেস সরকারের কোন একটা পদক্ষেপ সম্পর্কে এদের বিরুদ্ধতার ভান করার আসল উদ্দেশ্য হল জনগণকে বিভ্রান্ত করা ও নিজেদের 'বামপন্থী' ভাবমূর্তি ধরে রাখা। কারণ, আজও ভোটের বাজারে এই বামপন্থী বুলিই সি পি এম-সি পি আই-এর পুঁজি এবং এ হেন 'বামপন্থা'য় বুর্জোয়াদের কোনও ক্ষতি হয় না। ফলে, সি পি এম-সি পি আইয়ের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইউ পি এ সরকার অবাধে জনবিরোধী নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপি, রাজনৈতিক ময়দান থেকে মুছে যাওয়ার পরিবর্তে আবার উগ্র হিন্দুত্বের ভিত্তিতে নিজেদের সংহত করছে। ফলে, কেন্দ্রে বিজেপি'র পরিবর্তে অন্য একটি সরকার বসানোর দ্বারা বিজেপি'র সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করা যাবে — সি পি এম-সি পি আইয়ের এই বিশ্লেষণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

জনগণ কী করবে ?

তাহলে, এই অবস্থা থেকে বেরোবার পথ কী ? ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী আক্রমণকে একমাত্র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব। পাশাপাশি দেশব্যাপী আদর্শগত-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার বিষকে আটকানো যেতে পারে। ফলে, আজ দেশে সত্যিকারের একটা বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলা জরুরি প্রয়োজন, যেটা বুর্জোয়াদের লেজুড় নয়, জনগণের সংগ্রামের প্রকৃত হাতিয়ার হবে।

বিহার, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানার জনগণকে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মানুষের মতো বাঁচতে হলে তাদের লড়াই করতে হবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিজেদের সংগঠিত করতে হবে। আসন্ন নির্বাচনেও গণআন্দোলনের শক্তিকে খুঁজে নিয়ে তাকে সমর্থন দিতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে। বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া সমস্ত দলই এই পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার সেবা করছে। এরা কেউই জনগণের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনা। সি পি এম, সি পি আই-কেও বিশ্বাস করা যায় না। নির্বাচনী প্রচারের জাঁকজমক, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও টাকার খেলায় জনগণ যেন না ভোলেন, ভীতি ও হুমকির কাছে মাথা না নোয়ান। সমস্ত প্রলোভন ও হুমকির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, গণআন্দোলনের লাইনকেই, গণআন্দোলনের পতাকাবাহী একমাত্র দল এস ইউ সি আই-এর প্রার্থীদেরই শক্তিশালী করার জন্য জনগণের সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত। যেখানে এস ইউ সি আই-এর প্রার্থী নেই, সেখানে জনগণের উচিত এমন প্রার্থীদের সমর্থন করা, যাঁরা সৎ, পরীক্ষিত এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে কাজ করবেন। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। *(প্রার্থী তালিকা আটের পাতায়)*

প্রবীণ সদস্যের জীবনাবসান

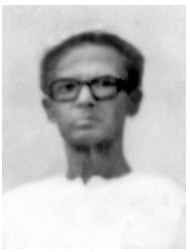

কলকাতার কালীঘাট এলাকায় দলের প্রবীণ সদস্য কমরেড অরুণেশ দেবমুন্সী (৮৫) দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৪ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৬০-এর দশকে নিজ চাকুরিস্থলে সিপিএম প্রভাবিত কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য থাকাকালে তাদের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, পাশাপাশি তদানীন্তন এস ইউ সি আই কর্মীদের সাথে পরিচিতির সুবাদে এস ইউ সি আই-এর নীতি আদর্শ তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। দলের কাছাকাছি আসার মধ্য দিয়ে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন, যা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ক্রমে ক্রমে কালীঘাট এলাকায় দলের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়। কালক্রমে তিনি দলের সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি এলাকায় বহু সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। বয়সের কারণে যখন তিনি ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, তখনও দলের আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচি সম্পর্কে তিনি অসীম আগ্রহে খোঁজ নিয়েছেন। অনুজ কর্মীদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালবাসা। প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান দলের রাসবিহারী-আলিপুর আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড রথীন গুঁই ও লেক আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশীষ রায়চৌধুরী। আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদিকা কমরেড সাধনা চৌধুরীর পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়।

অরুণেশ দেবমুন্সী লাল সেলাম

শিশুদের খোঁজ কে রাখে

চারের পাতার পর

জন্য শিশুদের বাজির কারখানা, ইটভাটা, বিড়ি কারখানা, খনি, রেস্টুরেন্ট, হকারি — প্রাপ্তবয়স্কদের মতো কোন্ কাজই না করতে হয়!

শিশুদের 'সুনিশ্চিত কৈশোরে' পৌঁছে দিতে হলে প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা। এসব বিষয়ে দেশের সরকারের প্রবণতা কী? স্বাস্থ্যখাতে ভারত সরকার মাথাপিছু ৮০ পয়সা খরচ করে। জাতীয় আয়ের ১.২৫ শতাংশ ব্যয় হতো এই খাতে ১৯৯৩-৯৪ সালে। আর তা ১৯৯৯-২০০০-এ কমে দাঁড়াল ০.৯ শতাংশে। এই ধারা আজও অব্যাহত। ''সকলের জন্য স্বাস্থ্য'' নামক জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির প্রবক্তা কংগ্রেস থেকে বিজেপি সরকার কি এর জবাব দেবে? শিক্ষার প্রশ্নে জাতীয় আয়ের ৪.৪ শতাংশ খরচ হতো ১৯৮৯ নাগাদ। ১৯৯৮-৯৯-এ তা এসে দাঁড়াল ২.৭৫%। ক্রমাগত এই খাতে ব্যয় কমছে। ১৯৮৬ সালেই সার্বজনীন শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে দিতে কংগ্রেস উত্থাপিত 'নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি' গৃহীত হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই সমান্তরালভাবে 'প্রথামুক্ত শিক্ষা' চালু করতে কেন্দ্র-রাজ্যগুলি বদ্ধপরিকর। প্রথাগত শিক্ষার আঙিনায় যারা এসে পড়ে তাদের ৭৭% লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় স্কুলে পাশ করার আগেই। সাবর্জনীন শিক্ষার দায় অভিভাবকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে এসেছে ডিপিইপি স্কীম। ১৯৯২ সালে পুরনো জাতীয় শিক্ষানীতির কিছু সংশোধন করে এই স্কীমকে অঙ্গীভূত করা হয়। রাজ্য সরকারও তাই করছে। ''Education is a unique investment'' (শিক্ষা বিনিয়োগের একটি চমৎকার ক্ষেত্র) — নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ করছে। বিশ্বব্যাঙ্কের শর্ত অনুযায়ী — ''Failing students in the classes will add financial loss'' (ফেল করা ছাত্ররা আর্থিক ক্ষতি বাড়াবে)। তাই এ রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল নেই। সিপিএম-কংগ্রেস জোট সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিতে চাইছে। নীতিগত বিরোধ কেন্দ্রে -রাজ্যে এ ব্যাপারে নেই। এই শিক্ষা প্রকল্পেরই উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাঙ্কের দলিলে বলা হয়েছে ঃ ''To restructure education in fulfilment of the new world order''। অশিক্ষা-স্বাস্থ্যহীনতা-অনাহারের পাশেই জোগান দেওয়া হচ্ছে মদের, ড্রাগের। এ রাজ্যে নতুন স্কুল খোলা না হলেও দেওয়া হচ্ছে মদের ঢালাও লাইসেন্স। এ ভাবেই শিশুরা পৌঁছে যাচ্ছে সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনে। নতুন বিশ্বব্যবস্থার (New world order) লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণ হচ্ছে। স্বাস্থ্যনীতির ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গি এক। টাকা যার চিকিৎসা তার — এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য হাতে হাত মিলিয়ে হাসপাতালের বেসরকারীকরণ করছে। রাজ্য সরকার গর্ব করে বলছে, জনগণের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের মুখাপেক্ষিতা কমানো সম্ভব হয়েছে। ছাঁটাই হচ্ছে স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়বরাদ্দ।

আমেরিকার শিশুরা কেমন আছে? সেদেশে ১২ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার! মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। 'ক্রিশ্চিয়ান মনিটর' পত্রিকা লিখেছে ঃ ৫ কোটি মার্কিনী 'ফ্রি কিচেন' (লঙ্গরখানা) থেকে খাবার সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে। ৩ কোটি মানুষ চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সেই ১৯৯২ সালেই গৃহহীনের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি। মাত্র ২৫ কোটি মানুষের এই দেশে গরিব বাড়ছে ১৩.৫ শতাংশ হারে। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অনাহার আর আশ্রয়হীনতার অনিশ্চিত জীবনে শিশু ও কিশোরজীবন হয়ে যাচ্ছে বিষাক্ত কলুষিত। আমেরিকার শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন রাষ্ট্রসচিব ১৯৯৩ সালে বলেছেন ঃ গত ৩০ বছরে হিংসাত্মক ঘটনা বেড়েছে ৫৬%, অবৈধ সন্তানের জন্ম বেড়েছে ৪০০%, বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়েছে ৪০০%, পিতামাতা-পরিত্যক্ত সন্তান বেড়েছে ৩০০%, অল্পবয়সীদের আত্মহত্যা বেড়েছে ২০০%, আর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গড় মেধা কমেছে ৭৫ পয়েন্ট! ('সর্বগ্রাসী অক্টোপাস')। '৯০ সালে সমীক্ষায় দেখা গেল খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, আত্মহত্যা, মদখাওয়া, গর্ভপাত, গর্ভবতী হয়ে পড়া প্রভৃতিতে আমেরিকা আজ শীর্ষস্থানে (দি স্টেটসম্যান ২৩-১১-০৪)।

২০০২ সালের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে, ভারতে প্রতিদিন ২৮ জন নারী যৌন নিপীড়নের শিকার। প্রতিদিন ৯৩ জনের শ্লীলতাহানি হয়েছে। প্রতিদিন ৪৫ জন নারী ধর্ষিতা হয়েছেন। প্রতিদিন ১৩৫ জন নারী স্বামী ও আত্মীয় দ্বারা নির্যাতিতা হয়েছেন। আর প্রতিদিন খুন হয়েছেন ১৮ জন নারী । প্রকৃত অবস্থার সামান্যই তো রেকর্ডে আসে। আসল অবস্থা আরও ভয়াবহ। এমন এক নরকে শিশু জন্মে কোন্ স্বর্গে পৌঁছোতে পারে? প্রায় ৩ কোটি নারীকে একটু অন্ন-বস্ত্রের জন্য দেহ ব্যবসাতে লিপ্ত হতে হচ্ছে এই দেশেই। এমন এক পরিবেশ যেখানে মায়েদের নির্যাতন শিশুদের দেখতে হয়, তারই মধ্যে বড় হতে হয়। সেই পরিবেশে কতটুকু নিরাপত্তা, কতটুকু মানসিক সুস্থতা গড়ে উঠতে পারে তাদের? বড়দের মতই কঠোর পরিশ্রম করে পেটভরানো, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, মদ, ড্রাগ, সাট্টা, জুয়া কলুষিত এ দেশের শৈশব কোন সুনিশ্চিত সুস্থ কৈশোর পাচ্ছে না। সব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেই ঘটছে শিশু-কিশোরদের এমন সর্বনাশ।

দেশে দেশে পুঁজিবাদবিরোধী যে শ্রেণী সংগ্রাম ও গণআন্দোলন চলছে সেই মহৎ সংগ্রামের সফলতার সঙ্গেই এই শিশু-কিশোরদের জীবন ও ভবিষ্যৎ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। বিশ্বজোড়া ঐ সংগ্রামের অংশ হিসাবে ভারতবর্ষেও পুঁজিবাদবিরোধী এই সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে তোলাই প্রতিটি পিতামাতার কর্তব্য। আর এই সংগ্রামকে বিকশিত করতে মেকি বামপন্থীদের শিশু-প্রেমের মুখোশও খুলে দিতে হবে। শিশুদের প্রতি ভালবাসা, কর্তব্য, দায়িত্ববোধের এটাই সুনির্দিষ্ট উপলব্ধি।

এই পৃথিবীকে যদি সত্যিই শিশুর বাসযোগ্য করতে হয়, যদি তাদের সুন্দর সুনিশ্চিত আনন্দময় এক কৈশোরে পৌঁছে দিতে হয়, পেটপুরে খাওয়া, সুন্দর স্বাস্থ্য, আবশ্যিক স্কুল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচিগত মানে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে হয় — তবে বিশ্বজোড়া যে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শৃঙ্খল চেপে বসে আছে তাকে ভাঙতে হবে, প্রতিটি দেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করতে হবে পুঁজিবাদকে। নইলে হাজার শিশুবর্ষ পার হয়ে যাবে, দুনিয়াটা শিশুদের বাসযোগ্য হয়ে উঠবে না কিছুতেই।

আন্দামানে ত্রাণকার্যে এস ইউ সি আই

একের পাতার পর

হাসমতাবাদে ত্রাণ শিবিরের কাজ চলেছে। কারনিকোবর দ্বীপ, হাড বে, ভারতের দক্ষিণতম অন্তরীপ ইন্দিরা পয়েন্ট প্রভৃতি দূর দূর এলাকা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষেরা ত্রাণশিবিরগুলিতে আসেন। পাহাড়ী এলাকাগুলিতে আশ্রয় নেওয়া মানুষেরাও এসেছেন। সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী ১৭ জানুয়ারি সকালে হোপ টাউন ও ব্যাম্বো ফ্ল্যাট অঞ্চলে শিবির চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অকৃপণ হাতে দলের ত্রাণভাণ্ডারে দান করার সময়, এই আস্থাও প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁদের সাহায্য দুর্গত এলাকায় পৌঁছবেই। সুদূর আন্দামানে পৌঁছানো সম্ভব হবে কিনা — এ প্রশ্নও অনেকের ছিল। বাধা ছিল অনেক। ত্রাণের কাজে যাওয়া সত্ত্বেও বিমান ভাড়ায় বিন্দুমাত্র ছাড় পাওয়া যায়নি। আন্দামানের পথ ঘাট, বসতি বিন্যাসও ছিল অজানা।

কিন্তু চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সাধারণ মানুষ ও আন্দামানবাসীদের সাহায্যে সে বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। কলকাতা থেকে স্বেচ্ছাসেবী জনস্বাস্থ্য সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং স্বেচ্ছাসেবী গণবিজ্ঞান সংগঠন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি নিজস্ব উদ্যোগে আন্দামান যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হাসপাতালের ও প্রাইভেট ডাক্তার, ওষুধের ক্ষুদ্র ডিলার, দোকানদার, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টটিভ প্রভৃতি পেশার মানুষেরা ওষুধ দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন। বিজ্ঞানী, ছাত্র ও বৃত্তিজীবীরা অর্থ দিয়েছেন।

দুই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে ডাঃ অশোক সামন্তের নেতৃত্বে এস ইউ সি আই-এর মেডিকেল ইউনিট আন্দামানে গিয়েছে। দলে রয়েছেন কমরেডস্ ডাঃ অনুপ মাইতি, ডাঃ ভবানীশঙ্কর দাস, সিস্টার টিউটর প্রীতি তারণ, ডাঃ নীলরতন নাইয়া, ডাঃ সুজিত চৌধুরী ও সহদেব সামন্ত এবং বিজ্ঞানী ডঃ মাখনলাল নন্দ চৌধুরী।

পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছানোর পর থেকেই প্রভূত সাহায্য করছে আন্দামানের বাঙালী ক্লাব এবং বনবিকাশ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। এদের সাহায্য ছাড়া দুর্গম এলাকায় পৌঁছানো সম্ভব হত না। এদের সহায়তায় ত্রাণের কাজ এখন চলবে।

তামিলনাড়ু ও কেরালায় পার্টির যে ত্রাণশিবির চলছে তা আগেই জানানো হয়েছে। ডাঃ কমরেড অংশুমান মিত্রের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের একটি চিকিৎসক দল তামিলনাড়ুর কাড্ডালোরে কাজ করছেন। ১৭ জানুয়ারি রাতে ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়ার নেতৃত্বে আর একটি স্বেচ্ছাসেবক দল তামিলনাড়ুর উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর কাড্ডালোরে এস ইউ সি আই-এর রিলিফ ক্যাম্প

যাত্রী কমিটির আবেদন

একের পাতার পর

বাড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য। জনৈক সাংবাদিক বলেন — উত্তরবঙ্গ থেকে বেশ কয়েকটি রকেট বাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য জায়গাতেও রুটের বাস তুলে নেওয়া হয় — এ বিষয়টি কি আপনারা আন্দোলনের মধ্যে নেবেন?

সম্পাদক সদানন্দ বাগল বলেন, আমরা পরিবহণ পরিষেবায় যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, নিয়মিত বাস চলাচল সহ সমস্ত বিষয় আন্দোলনের মধ্যে নেব। আপনার কাছ থেকে উত্তরবঙ্গের এই বিষয়টি আমরা জানলাম। তেমনি জেলায় জেলায় এ ধরনের বিষয়গুলি আমাদের কমিটির গোচরে যেমন যেমন আসবে তেমন তেমন যাত্রী আন্দোলন আমরা গড়ে তুলব। পরিশেষে তিনি সাংবাদিক সহ সর্বস্তরের জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা চান।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ অশীতিপর অধ্যাপক কান্তীশ মাইতি, অধ্যাপিকা চৈতালি দত্ত এবং কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি অজয় চ্যাটার্জী। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলা হয় — ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে পরিবহণ ব্যবস্থা চূড়ান্ত অবহেলিত এবং ভাড়াও বেশি। এর উপর ভাড়াবৃদ্ধির জন্য যে স্টেজ এবং দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়, সরকার, আর টি এ এবং মালিকদের যোগসাজশে তার মাপেও থাকে কারচুপি; ফলে যাত্রীদের পকেট কেটে মালিকরা অনেক বেশি আদায় করে নেয়।

ইদানীং ভাড়াবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর একটি কৌশল নেওয়া হচ্ছে। সমস্ত জেলায় এমনকী জেলার সব রুটেও একসঙ্গে ভাড়া বাড়ানো হয় না। উদ্দেশ্য যাত্রীবিক্ষোভ যাতে একসঙ্গে গড়ে না ওঠে এবং যেমন খুশি ভাড়া বাড়ানো যায়।

কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় — অবিলম্বে পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধির অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। শুধু মালিকদের সাথে নয়, যাত্রীসাধারণ এবং বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করেই পরিবহণের ভাড়া-কাঠামো স্থির করতে হবে। বাস মালিকদের ওপর থেকে বর্ধিত কর, অহেতুক জরিমানা নেওয়া এবং পুলিশের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ডিজেলের উপর রাজ্য সরকারের বিক্রয় কর কমাতে হবে এবং সেস সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে।

বলা হয় — বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার সহ উপরের দাবিগুলি পূরণ করা না হলে, জেলায় জেলায় কনভেনশন, যাত্রী কমিটি গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সর্বগ্রাসী পুঁজির ঔদ্ধত্য

একের পাতার পর

তাই তেমন আন্দোলনের বিরুদ্ধেও কখনো কখনো মালিকশ্রেণী দাঁড়ায়। আসলে তাদের ভয় আন্দোলনের শরিক জনগণকে এবং জনস্বার্থবাহী নেতৃত্বকে।

প্রধানমন্ত্রী পরে ক্ষমা চেয়েছেন অনেকটা পা মাড়িয়ে 'সরি' বলার মতো। ক্ষমা চেয়েছেন, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে। তাই এ ক্ষমাপ্রার্থনা আন্তরিক নয়, লোকদেখানো। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বর্তমান যুগে পুঁজি এখন 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর'-এর স্থান নিতে চাইছে। হোটেলের, প্রমোদকক্ষের, অভিজাত ক্লাবের বিচ্ছিন্নতা ছেড়ে পুঁজি এখন পুরনো যুগের সমাজপতির ভূমিকা নিতে চায়। দেশগৌরব কে ? ধীরুভাই আম্বানি। কৃতী পুরুষ কে ? যিনি দেশে বিদেশে পুঁজির গোলামি করে অনেক টাকা করেছেন। এঁদের উদ্যম, এঁদের কর্মতৎপরতাকে এখন জাতির সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে দাঁড় করানো হচ্ছে। পুঁজি ও পুঁজির মালিকই যেন সভ্যতার সারথি, জ্ঞান-বিদ্যা-শিক্ষা সব তার সেবাদাস। পুঁজির এই ঔদ্ধত্যই জাতীয় গ্রন্থাগারের ঘটনায় প্রকাশ পেল। পুঁজির মালিকরা জাতীয় গ্রন্থাগারের বুকে দাঁড়িয়ে অনুচ্চারিত ভাষায় বলে গেল — এদেশের জল-স্থল-উদ্যান-অরণ্য, এর বিদ্যা-শিক্ষা-ঐতিহ্য — সবই পুঁজির মালিকের ; এর অস্তিত্ব পুঁজির করুণানির্ভর।

দেড়শো বছর আগে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে পুঁজির শাসনের পরিণাম দেখাতে গিয়ে মার্ক্স বলেছিলেন, এই ব্যবস্থায় যা কিছু শুভ্র তা হয় কলঙ্কিত, মূল্যবান যা কিছু তা বাতাসে মিলিয়ে যায়। মার্ক্সের একথা কতখানি সত্য তা আর একবার প্রমাণ হল জাতীয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণ মুনাফালোভীদের দখলে যাওয়ায় — সেটা একদিন না প্রতিদিন তা বড় কথা নয়।

অন্যায় ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ করুন

এস ইউ সি আই

পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে জনগণকে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৭ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

''ইতিপূর্বে দফায় দফায় ভাড়া বাড়িয়ে মালিকরা অত্যধিক লাভ করেছে, যার জন্য প্রায় দেড় মাস আগে ডিজেলের দাম বাড়লেও মালিকরা পুরনো ভাড়াতেই বাস চালিয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই লোকসান করে নয়।

আমরা বার বার দাবি করেছি একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দিয়ে মালিকদের আয়/ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়ে সকল রাজনৈতিক দল ও যাত্রী কমিটির সামনে তা উপস্থিত করা হোক। কিন্তু রাজ্য সরকার সেটা না করে নিজেদের ফ্রন্টের দলগুলিকে নিয়ে ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করে জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সরকার ইতিপূর্বে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলে ভাড়া বাড়ালেও বিন্দুমাত্র কিছু করেনি। সরকার যে কতটা যাত্রীস্বার্থবিরোধী এটা বোঝা যায় ডিজেলে না চললেও বারবার ট্রামের ভাড়া বাড়ানোয়।

বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে সর্বত্র যাত্রী কমিটি গঠন করে প্রতিরোধ আন্দোলন করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।''

তিন রাজ্যে এস ইউ সি আই প্রার্থী তালিকা

বিহার

	কেন্দ্র	প্রার্থী
জেলা মুজঃফরপুর		
	১। পারা	কমরেড রামপ্রীত রাই
	২। কাঁটি	কমরেড লখিচাঁদ রাই
	৩। সাকরা	কমরেড অশোককুমার পাশোয়ান
	৪। মুজঃফরপুর শহর	কমরেড মহম্মদ ইদ্রিস
	৫। সাহেবগঞ্জ	কমরেড যাদবলাল প্যাটেল
	৬। মীনাপুর	কমরেড দীনেশপ্রসাদ যাদব
জেলা বৈশালী		
	৭। লালগঞ্জ	কমরেড রাজেন্দ্র শর্মা
জেলা ঔরঙ্গাবাদ		
	৮। নবীনগর	কমরেড রামাধীন সিং
জেলা বাঁকা		
	৯। বেলহার	কমরেড কেদার পণ্ডিত
জেলা মুঙ্গের		
	১০। তারাপুর	কমরেড ভরত মণ্ডল
	১১। হাভেলি-খড়্গপুর	কমরেড ভোলা তাঁতি
	১২। জামালপুর	(পরে ঘোষিত হবে)
জেলা অরোয়াল		
	১৩। কুরথা	কমরেড বীরেন্দ্র রঞ্জন
জেলা বেগুসরাই		
	১৪। বাখরি	(পরে ঘোষিত হবে)

ঝাড়খণ্ড

জেলা পূর্ব সিংভূম		
	১। বহড়াগোড়া	কমরেড সরলা মাহাতো
	২। ঘাটশিলা	কমরেড পুটু সিং
জেলা বোকারো		
	৩। চন্দন কেয়ারী	কমরেড মাহিন্দর রাজওয়ার
জেলা সরাইকেলা খরশোয়া		
	৪। সরাইকেলা	(পরে ঘোষিত হবে)

হরিয়ানা

জেলা	কেন্দ্র	প্রার্থী
রোহটক	রোহটক	কমরেড কান্তা শর্মা
ঝজ্জর	সালহাস	কমরেড কর্তার সিং
রেওয়ারি	রেওয়ারি	কমরেড রমেশ চন্দ্র
রেওয়ারি	জাটুসানা	কমরেড ঈশ্বর সিং
মহেন্দ্রগড়	আটেলি	কমরেড বলবীর সিং
কৈথাল	পুন্দরি	কমরেড বাবু রাম
ভিওয়ানি	ভিওয়ানি	কমরেড রাজ কুমার
সোনেপত	রাই	কমরেড দেবেন্দ্র সিং

তামিলনাড়ুতে ত্রাণকার্যে এস ইউ সি আই

একের পাতার পর

থেকে তিনজনের একটি দল ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ু পৌঁছেছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি ও কর্ণাটক থেকেও এস ইউ সি আই স্বেচ্ছাসেবক ও চিকিৎসকদল যাচ্ছে।

গণদাবীর গত সংখ্যায় আমরা লিখেছিলাম, দুর্গত এলাকার প্রয়োজন বুঝে নিতে পর্যবেক্ষক দল আগেই পাঠানো হয়েছিল। তার ভিত্তিতে কলকাতা থেকে প্রেরিত পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দলটি কাড্ডালোরের পারিঙ্গিপেট্টাই যায় ও সেখান থেকে পুধুকুপ্পম-এ কলকাতা থেকে পাঠানো দুটি তাঁবুর একটি খাটিয়ে মূল ত্রাণশিবির বসিয়েছে। ১৩ই জানুয়ারি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নাগপট্টিনমে দ্বিতীয় তাঁবু খাটিয়ে ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে।

১৩ জানুয়ারি সকালে এস ইউ সি আই কর্মী ও ডাক্তারদের একটি দল পণ্ডিচেরির বিল্লুপুরমে পৌঁছে ত্রাণের কাজ শুরু করেছে।

পারিঙ্গিপেট্টাই এবং নাগপট্টিনম-এর মাঝে বহু বিচ্ছিন্ন এলাকায় জরুরি ত্রাণের প্রয়োজন রয়েছে। দলের তামিলনাড়ু রাজ্য সম্পাদক জানিয়েছেন, তিরুমালাইবাসাল-এ আর একটি শিবির খোলা হচ্ছে। প্রতিটি শিবিরেই দৈনিক শতাধিক বিপন্ন মানুষের চিকিৎসা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের সকল রাজ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী, ওষুধ কেরালা ও তামিলনাড়ুতে পাঠানো চলছে। আন্দামানেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে টীম গিয়েছে।

এবারে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করার সময় দলের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যে গভীর আস্থা স্থাপন করেছেন এবং যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব — একথা আমরা আগেও বলেছি। গণআন্দোলনে যেমন, তেমনভাবেই বিপন্ন জনগণের পাশে অবিচলভাবে দাঁড়ানো আমাদের বিপ্লবী কর্তব্যেরই অঙ্গ। তামিলনাড়ুর বিভিন্ন এলাকায় চিকিৎসা ছাড়াও ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজেও গ্রামবাসীদের সঙ্গে ত্রাণকর্মীরা যোগ দিয়েছেন, ভেঙে-পড়া ঘর আবার তৈরিতে গ্রামবাসীদের সাহায্য করছেন। গ্রামীণ যুবকরা আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করছেন। তামিলনাড়ুর সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেও অনেকে এসে ত্রাণসামগ্রী জমা দিয়ে যাচ্ছেন এস ইউ সি আই ত্রাণশিবিরে।

এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে পাটনায় ত্রাণসংগ্রহে কমসোমল কর্মীরা

কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী
স্টল নং - ৩৩০

সুনামি দুর্গতদের জন্য
এস ইউ সি আই ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে সাহায্য করুন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net